চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

CHIN TIBBAT MONGOLIA
Two travelogues on China, Tibet and Mongolia
by Sankar Ranjan Roychoudhury

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৭

ISBN: 81-86891-62-5

প্রচ্ছদ: রুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদের ছবি: শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম ৬০ টাকা

যে কথা আগে বলা দরকার

একটা সময় ছিল যখন রুশপন্থী বলে কেউ মসকরা করলে মনে মনে আহ্লাদিত হতাম, আবার প্রতিপক্ষকে মাওপন্থী বলে ব্যঙ্গ করে গায়ের ঝাল মেটাতাম। মনে হত, বেশ এক হাত নেওয়া গেল। সে হল বিগত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশকের কথা, রাজনীতির তত্ত্বকথার আগুনে গা গরম করে নেওয়ার দিন। বিপ্লব তো এসেই গেল দেশে, শুধু কোন পথে আসে— জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার হাত ধরে, নাকি জনগণতান্ত্রিক মোর্চার পিছু পিছু— সেইটা দেখার অপেক্ষায় সবাই। তাই নিয়ে মহাতর্ক কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুই দলে। দলটা ভাগই হয়ে গেল শেষপর্যন্ত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হল। আমরা, মানে যারা মূল দলে রয়ে গেলাম, হলাম জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা। তখন রাশিয়া আমাদের স্বপ্নের দেশ, আর চিন দুঃস্বপ্নের দেশ। দুই দেশের অবস্থান ছিল মনের দুই বিপরীত মেরুতে। বিপ্লবের উত্তাপ শেষপর্যন্ত মিইয়ে গেল। জাতীয় গণতন্ত্র আর জনগণতন্ত্রকে মুলতবি রেখে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই দলই। যাক সে রাজনীতির তত্ত্বকথা।

১৯৭৭ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিলাম। তারপর থেকেই রাশিয়া আর চিন এই দুই দেশ সম্পর্কে আমার মনের অবস্থান পরিবর্তিত হল, ভাবনায় পক্ষপাতিত্ব দূর হল। একইসঙ্গে দুই দেশকে দেখে ভালো-মন্দ বিচার করার বাসনা তৈরি হল। একপেশে মন নিয়ে নিরপেক্ষ বিচার করা কখনওই সম্ভব নয়। আজ রুশপন্থী নই, চিনবিদ্বেষীও নই। ওসবের ঊর্ধ্বে এখন। পক্ষপাতশূন্য মন নিয়ে দেখব দুটো দেশকে, দুটো পথকে, বিচার করব ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক। দীর্ঘকাল রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে একেবারে রাজনীতির বাইরে চলে আসা সহজ ব্যাপার নয়। মনকে শান্ত করতে আরও কয়েক বছর সময় কেটে গেল।

রাশিয়ায় ইংরিজি চলে না, শুনেছি যারা রাশিয়ায় থাকে বা সেদেশ ঘুরে এসেছে এমন অনেক বন্ধুর মুখে। দোভাষী সঙ্গে নিয়ে একটা দেশে দু-চার দিন বেড়ানো যায়, ইতিহাস-ভূগোল প্রসিদ্ধ, দু-চারটে জিনিস দেখা যায় কিন্তু সেদেশটাকে জানা যায় না। অতএব দোভাষী সঙ্গে নিয়ে হবে না, রুশ ভাষা শিখতে হবে। আগে রাশিয়া তারপর চিন, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, ১৯৮১ সালে রুশ ভাষা চর্চা শুরু করলাম। অনেকদিন শিখলাম, কাজ চালাবার মতো ভালোভাবেই শিখলাম।

বিদেশভ্রমণ শুরু করেছি ১৯৮৯ সালে। গোল পৃথিবীটাকে চক্কর খেতে খেতে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ঘুরতে ঘুরতে রাশিয়ায় এসে পৌঁছনো গেল অনেক পরে, ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে।

এবার চিন। চিনেও তো ভাষা সমস্যা হবে জানি। অতএব চিনা ভাষাটাও শিখে ফেলা যাক। কিন্তু শিখব বললেই তো আর শেখা যাবে না। কলেজ থেকে অবসর নিয়েছি, সেও অনেক বছর হয়ে গেল। এই বয়সে নতুন করে শেখার উদ্যম কি আর আসে! তবু শিখতে তো হবেই। দিল্লিতে চিন রাষ্ট্রদূতাবাসে চিঠি লিখলাম,— চিনা ভাষা শিখতে চাই, কী বই আছে, কোথায় পাওয়া যাবে, কেমন দাম, সন্ধান দিলে বাধিত হব। এক মাসের মাথায় চিঠির উত্তর পেলাম। শুধু উত্তর নয়, সেইসঙ্গে একটা মোটা পার্সেল। প্যাকেট খুলে তো বিস্ময়ের অন্ত নেই। চারখণ্ডের বই, প্র্যাক্টিক্যাল চাইনিজ রিডার, আনন্দে আত্মহারা। শুধু একটা চিঠির জবাবে এত মূল্যবান একটা উপহার! এত উদার এরা! জানাই ছিল না। উদ্যমে জোয়ার এল। শুরু করে দিলাম। চিনা ভাষায় পণ্ডিত সুখরঞ্জন মৈত্রর কাছে দু-চার দিন, তারপর ভাস্কর দেব মুখার্জির কাছে আরও দু-চার দিন পাঠ নিয়ে বুঝলাম এমন ঢিমেতালে হবে না। রুশ ভাষা শিখেছিলাম যেভাবে সেইভাবেই শিখতে হবে।

এদিকে, ইউনেস্কোর স্বাস্থ্যদপ্তর 'হু'-র নির্দেশে চিন যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বেশ কিছুদিন। কারণ, সার্স নামক মানুষখেকো রোগের উৎপত্তি নাকি চিন থেকে, সেদেশের মুরগি থেকে মানুষে এই রোগ ছড়াচ্ছে। বিপরীতে হিত হল। এই সুযোগে ভাষাটা ভালো করে শিখে ফেলা যাক। সাত-পাঁচ ভেবে শেষপর্যন্ত পুরোপুরি ছাত্রই বনে গেলাম।

বছর শেষ হতে চলল। হঠাৎই একদিন কাগজে খবর এল, 'হু' ঘোষণা করেছে— চিন সার্সমুক্ত হয়েছে। সেদেশে যেতে আর কোনও বাধা নেই। সঙ্গে সঙ্গে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে ফেললাম।

২০০৪-এর ১১ জুলাই, বেরিয়ে পড়লাম মাত্র এক বছরের বিদ্যা নিয়ে। বিপদের সহায় হিসেবে সঙ্গে নিলাম প্র্যাক্টিক্যাল চাইনিজ রিডার, এলিমেন্টারি চাইনিজ রিডার, ক্লাসের খাতা আর নোটবই। পথেঘাটে দরকারে আসতে পারে এমন কিছু বাক্যালাপ লিখিয়ে নিলাম মাস্টারমশাই মিস্টার ওয়ালিকে দিয়ে।

যাত্রার আগে সেই পুরনোকালের রুশপন্থী অনুজপ্রতিম রামানন্দ একদিন বলল, 'দাদা, চিন ঘুরে এসে ভালো করে একটা বই লেখো দেখি।'

কথাটা নিতান্তই হালকা চালের ছিল কিন্তু কেমন করে যেন আমার উদ্যমের জোয়ারে বান এনে দিল। ভ্রমণসূচিতে ছিল ৪৫ দিনে হংকং, চিন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান, গড়ে ৯ দিন করে ঘুরব একেকটা দেশ। রামানন্দর কথা স্মরণ করে ভ্রমণসূচির পরিবর্তন করলাম। দুটো দিন হংকং কাটিয়ে চলে গেলাম চিন। ২৫ দিন কাটালাম শুধু চিনে, তার মধ্যে ৩ দিন তিব্বতের লাসা।

রাশিয়া ভ্রমণে কিছু সুবিধা ছিল। রুশ ভাষা তিন-চার বছর চর্চা করে ভাষাটা অনেক সড়গড় হয়েছিল। তাই ভাষা সমস্যার ভয় ছিল না। তাছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম সেদেশে। তার থেকেও বড় সুবিধা ছিল, মস্কোতে প্রচুর প্রবাসী বাঙালি আছে, যারা দীর্ঘদিন বসবাস করছে ওদেশে। মস্কোর দুর্গাপূজা মণ্ডপে সবাইকে পেয়েছিলাম একসঙ্গে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভেঙে যাওয়ার আগের রাশিয়া আর পরের রাশিয়াকে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম এদের কাছ থেকে। চিন ভ্রমণে সেসব সুযোগ ছিল না।

চিনা লিপি 'হানচি' যাকে বলে চাইনিজ ক্যারেক্টার, বড় জটিল। বর্ণমালা নেই তো, একেকটা ক্যারেক্টার মানে একেকটা শব্দ। একবছরে শতিনেক ক্যারেক্টার শেখানো হয়। ৩০০টা ক্যারেক্টার মানে ৩০০ টা শব্দ। চিনে পৌঁছতে পৌঁছতে তার অনেকটাই ভুলে গেছি। আর ওদেশে কোনও ভারতীয় থাকে না। মিস্টার ওয়ালির মেয়ে-জামাই থাকে বটে কিন্তু সে পেইচিং থেকে অনেক দূরে। আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যাচ্ছি না, দেশের সরকারের প্রতিনিধি বা আমলা কোনওটাই নই। কতটা আমল দেবে, কতটা জানার সুযোগ পাব, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় ছিল।

সেদেশে পৌঁছে সব সংশয় দূর হল। একজন সাধারণ পর্যটক হিসেবে একটা নতুন দেশে যতটা অভ্যর্থনা আশা করা যায়, তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। পথ চলতে চলতে আলাপে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর আন্তরিক আদর, আপ্যায়ন, অকৃপণ সাহায্য, বিপদে কিশোর বালকের অযাচিত সাহায্য, পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ওয়াং ছি ওয়েনের সঙ্গে ঘণ্টা দুইয়ের সাক্ষাৎকার, এসবই আমার কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত, অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়। এখন পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় ৬০ টা দেশ দেখা হয়েছে। অনেক দেশে অনেক কিছু পাওনার বাইরে পেয়েছি। কিন্তু নিঃসংশয়ে বলতে পারি, ঠিক এইরকমটি কোনও দেশে পাইনি।

আমার চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়ায় বেড়ানোর কাহিনী 'ভ্রমণ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বই হিসেবে এই ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করার জন্য স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর কাছে কৃতজ্ঞতার ডোরে বাঁধা পড়লাম।

৯ জানুয়ারি, ২০০৭ — শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন বৃত্তান্ত রচনায় প্রেরণাদাতা
প্রীতিভাজন রামানন্দ গুহকে

চিন যেমন দেখলাম

২০০৪-এর ১১ জুলাই কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়লাম চিন ভ্রমণে। হংকংয়ের হুন হাম স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল সকাল ১০টা বেজে ৭ মিনিটে। লো উ পৌঁছলাম ১০টা ৪৫ মিনিটে। এটাই হংকংয়ের উত্তর সীমানা। এখন যাব চিনে। অভিবাসন দপ্তরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে মানসিক ধন্দে পড়লাম। ১৯৯৯ সালে ইংরেজরা হংকং থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে বিদায় নিয়েছে, আর চিন তার দখল নিয়েছে। এ তো কায়েমী ব্যবস্থা। সুতরাং হংকং এখন চিনের অংশ। তবে কেন হংকং থেকে চিনে যেতে অভিবাসনের নিয়মকানুন মানতে হবে!

পুরনোদিনের পাতা উল্টে একটু দেখা যাক।

রানির সনদ নিয়ে ফিরিঙ্গি বণিকরা নৌবহর সাজিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নানা দেশে বাণিজ্য করতে। ওদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল এশিয়ার নির্বিরোধী প্রাচীন সমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর। চিনে এল রেশম আর পোর্সেলিনের লোভে। কিন্তু বিনিময়ে চিন কী নেবে ওদের কাছ থেকে? প্রাচীন সভ্যতা আর উন্নত শিল্পকলা হল চিনের আভিজাত্য। সেই আভিজাত্য বজায় রেখে বিদেশি ব্যাপারিদের কাছ থেকে কী নিতে পারে? টুকিটাকি শৌখিন দ্রব্য, তার বেশি আর কিছু নয়। সে আর কত কেনা যায়। জিনিসের বদলে জিনিস, বাণিজ্যের প্রাচীন নীতি আর চলে না। ঠিক আছে, দাম হিসেবে তোমরা পাবে রুপো। চুক্তি হল মাঞ্চু রাজার সঙ্গে।

মাঞ্চু বা চিং রাজবংশের আগে মিং রাজবংশ ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় তিনশো বছর চিনে রাজত্ব করেছে। পারিবারিক কোন্দল আর অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে পড়েছিল মিং রাজারা। প্রশাসনে আমলাদের দলাদলি, তার ওপর খোজাদের প্রশাসনের কাজে নাক গলানোর চেষ্টা, সব মিলিয়ে দেশের শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। সুযোগ বুঝে বংশের শেষ প্রতিনিধি লি ছু-চেং বিদ্রোহ করে সিংহাসনে বসেছিল। সে ছিল দস্যুপ্রকৃতির। তাকে গদিচ্যুত করবার জন্য আমলারা সাহায্য চাইল উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার চিং বা মাঞ্চু রাজার। মাঞ্চু রাজা সুযোগ বুঝে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিনে এসে শাসন ক্ষমতা দখল করে বসল। এ হল ১৬৪৪ সালের কথা।

মাঞ্চুদের শাসনকালেই ফিরিঙ্গি বণিকরা এল চিনে বাণিজ্য করতে। অল্পদিনেই ফিরিঙ্গি বণিকরা বুঝল এভাবে ব্যবসায়ে ওদেরই লোকসান। এত পুঁজি ভেঙে ব্যবসা। রুপো চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। অতএব বিকল্প কিছু লোভনীয় জিনিস চাই যা চিনারা খুশি হয়ে নেবে।

খুঁজে পেল বিকল্প জিনিস। আফিং। আফিংয়ের নেশায় মাতিয়ে রাখবে গোটা জাতটাকে, আর সেই ফাঁকে রেশম আর পোর্সেলিনে সাজিয়ে তরণী ভাসিয়ে পাড়ি দেবে দেশ-দেশান্তরে। ফল পেল হাতে হাতে। হাওয়া ঘুরে গেল। রুপো এবার উল্টোমুখো হল। আগে আসছিল ইউরোপ থেকে চিনে, এখন সেই রুপো চলে যাচ্ছে চিন থেকে ইউরোপে। শুধু জিনিস দিয়ে আফিংয়ের দাম মেটানো যাচ্ছে না।

মাঞ্চু রাজা বুঝল গতিক ভালো না। জাতটা তো উচ্ছন্নে যাবেই, রাজকোষও যে ফাঁকা হয়ে যাবে। আর কোনও উপায় নেই। বিদেশ থেকে আফিং কেনা নিষিদ্ধ করল।

তাতে লাভ হল না। চোরাপথে আফিং কেনাবেচা চললই। আফিংয়ের মৌতাতে মশগুল গোটা জাতটা। কে রাজার আদেশ মানে! ১৮৩৯ সালের কথা। রাজা মরিয়া হয়ে ক্যান্টন বন্দরে ইংরেজ বণিকদের মজুত করা সমস্ত আফিং বাজেয়াপ্ত করল। আফিংয়ের চোরাকারবারি তো সবাই ফিরিঙ্গি। তারা সবাই মিলে রে রে করে উঠল, অভিযোগ করল নিজের দেশের সরকারের কাছে। এরই মধ্যে এক মাতাল ইংরেজ বণিক এক চিনা গ্রামবাসীকে খুন করে বসল। খুনির বিচার হবে কোথায়? বিবাদ শুরু হল চিনে ইংরেজে।

আমাদের দেশের অপরাধী আমাদের আইনে আমাদের আদালতে বিচার হবে। ইংরেজ সরকার খুনিকে চিনা আদালতে তুলতে অস্বীকার করল।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল। ইংরেজের আছে কামানের জোর। লাগল লড়াই। চিন হেরে গেল। নানকিং সন্ধি হল ১৮৪২-এ। যতরকম সুবিধা আদায় করা যায় সব করে নিল ব্রিটিশ সরকার। যুদ্ধের খরচ চিন দেবে, হংকং সহ পাঁচটা বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিতে হবে, ফিরিঙ্গিদের বসবাসের অধিকার দিতে হবে, ব্রিটিশ নাগরিকের বিচার ব্রিটিশ আদালতে হবে। মনে পড়ে, ইংরেজরা ভারতবাসীর ওপর একই আইন গায়ের জোরে চাপিয়ে দিয়েছিল? এই আইনের জোরে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিচার ভারতের কোনও আদালতে হত না, আর ব্রিটেনের আদালতের বিচারে ওদের কোনও শাস্তি হত না।

এই হল আফিং যুদ্ধ। আফিং যুদ্ধ আরও একবার হয়েছিল, ১৮৫৬ সালে। সে অন্য অছিলায়। বাণিজ্যের সময়সীমা বৃদ্ধি করবার আবেদন করে ব্যর্থ হল ইংরেজ বণিকরা। ঠিক সেই সময় কিছু চিনা 'অ্যারো' নামে এক ব্রিটিশ জাহাজে উঠে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে এনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ইঙ্গ-চিন যুদ্ধ। কে এক ফরাসি পাদ্রিকে নাকি চিনের কোনও এক গ্রামে খুন করেছে এক চিনা। সেই অজুহাতে ফরাসিরাও ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিল সেই যুদ্ধে। এবারও চিন হেরে গেল। তিয়েনশিন সন্ধি হল। চিনকে মাসুল দিতে হল অনেক, আগের যুদ্ধের থেকেও বেশি। তারপর সই হল পিকিং চুক্তিপত্র। এই যুদ্ধকে অ্যারো যুদ্ধও বলে।

১৮৯৯ সালে চিনের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের এক ইজারা চুক্তি হল। চিন হংকং সহ ২৩৫টা দ্বীপ ইংরেজদের ইজারা দিল ৯৯ বছরের জন্য। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন সেই ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ১ জুলাই হংকং সহ ইজারার সমস্ত ভূখণ্ডে চিনের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে হংকং হল চিন প্রজাতন্ত্রের একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল। তা না হয় হল। তাই বলে বিদেশে হংকংয়ের রাষ্ট্রদূত অফিস, হংকংয়ের নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা, চিনের টাকা হংকংয়ে চলে না, হংকংয়ের টাকা চিনে চলে না, হংকংয়ে যেতে হলে পর্যটকদের হংকংয়ের অভিবাসন দপ্তর থেকে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে, চিন সরকারের দেওয়া ভিসা চলবে না— এক দেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা হল না কি? ওইতেই তো আমার ধন্দ।

আমি ধরে নিয়েছিলাম হংকং থেকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি নিতে হবে না, শুধু পাসপোর্টটা দেখানোর জন্যই লাইনে দাঁড়ানো। কিন্তু লাইন এগোতে এগোতে যখন জানলার একেবারে সামনে এসে পড়লাম তখন বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক নয়। সুতরাং অনুমতিপত্রের নমুনা সংগ্রহ করে এনে তাকে পূরণ করে আবার জানলায় আসতে হল। তাই আমার একটু বেশি সময় লাগল। এরপর সবাই মিলে হাঁটাপথে গুটিগুটি এগিয়ে চললাম। মাত্র মিনিটপাঁচেক। তারপর একটা ছোট্ট খাল। খালের ওপর সেতু। সেতু পার হয়ে আরেক ছাদের নীচে ঢুকলাম। আবার রাষ্ট্রীয় নিয়মের দরজায় দাঁড়াতে হল। এবার চিনের শুল্ক বিভাগের ছাড়পত্র নিতে হবে। যাত্রীদের মধ্যে যারা হংকংবাসী তাদের এখানে ভিসা করতে হল। তাড়াতাড়িই মিটল সব।

২

এখন চিনের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। জায়গাটার নাম শেনচেন। যৌবনের প্রথম স্বপ্নের দেশ রাশিয়া ভ্রমণ হয়েছে দুবছর আগে। তার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম অনেক আগে থেকে। সেদেশে ইংরিজি চলে না তাই রুশ ভাষা ভালো করে আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। এবার দ্বিতীয় স্বপ্নের দেশ চিন দেখব। এদেশেও ইংরিজি চলে না। তাই চিনা ভাষা চর্চাও শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু শেষ করবার ধৈর্য আর ধরে রাখতে পারিনি, মাত্র এক বৎসরের বিদ্যা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি চিন ভ্রমণে। ঠেকা দেওয়ার জন্য সঙ্গে রেখেছি এলিমেন্টারি চাইনিজ রিডার, প্র্যাক্টিক্যাল চাইনিজ রিডার আর ক্লাসের খাতা। তাতে চিনা শিক্ষক ওয়ালিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলাম কিছু প্রয়োজনীয় চিনা কথোপকথন পথেঘাটে যা দরকারে লাগতে পারে।

সময়ের ব্যবধান মাত্র পাঁচ মিনিট, স্থানের ব্যবধান মাত্র একটা সেতু কিন্তু পরিবেশের ব্যবধান অপরিসীম। বুঝতে অসুবিধে হয় না, নতুন দেশে এসে পড়েছি। অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম পরিবেশটা একেবারেই অপরিচিত, আমার কল্পনার ছবির মধ্যে ছিল না।

চার-পাঁচটি লোক আমাকে ঘিরে ধরল, চারদিক থেকে আমাকে টানাটানি করতে লাগল। আমি যেতে চাইছি অনুসন্ধান অফিসে। এদের একজন আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে সামনের দিকে, আর একজন পিছনদিকে আঙুল দেখিয়ে ওইদিকে যেতে

বলছে। বিরক্ত হয়ে এদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছি। একজনকে ভাগাই তো আরেকজন এসে ধরে। তার মধ্যে বাটি হাতে এক বুড়ি এসে দাঁড়াল সামনে। এমন পরিস্থিতিতে ভিখিরির প্রতি সহৃদয়তা হৃদয় থেকে উৎসারিত হল না। এদের কথা একটুও বুঝতে পারছি না।

বোঝাবুঝির সমস্যা যে হবে তা জানা ছিল। ভাষা ছোং উয়েন হলে কী হবে, উত্তর আর দক্ষিণ চিনে উচ্চারণের অনেক তফাত, ঠিক যেমন তফাত নোয়াখালি-চিটাগাঙের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাংলা উচ্চারণে। পিকিং ডায়ালেক্ট অর্থাৎ উত্তর চিনের ডায়ালেক্টই বহুল প্রচলিত। শিক্ষিত সমাজে এটাই চলে। বিদেশে ওই ডায়ালেক্টেই চিনা ভাষা শেখানো হয়। আমিও তাই শিখে এসেছি। এখন দাঁড়িয়ে আছি চিনের দক্ষিণ সীমানায়। ওরা আমার কথা বুঝছে না, আমিও বুঝতে পারছি না ওদের কথা।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অনুসন্ধান অফিস পাওয়া গেল না। সম্ভবত এখানে কোনও অনুসন্ধান অফিস নেই। তবে খুঁজে পেলাম বাসস্ট্যান্ড। বিস্ময় শুরু হল এখান থেকে। অনেক বড় বাস স্ট্যান্ড। বড় বড় বাস, সুন্দর ঝকঝকে, ঠিক যেমনটি হয় আমাদের শহরের চার্টার্ড বাস বা কোনও ট্যুর কোম্পানির বিলাসবহুল বাস। তবে যে চিন গরিব দেশ, দেশের দক্ষিণ সীমার এক গাঁয়ের বাসস্ট্যান্ড এটা। এখানে থাকবে পুরনো, ভাঙাচোরা, ঝরঝরে দুটো-একটা বাস। এ কী দেখছি! বাসস্ট্যান্ড মানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ভাঙা পাঁচিলে ঘেরা কর্দমাক্ত কিছুটা জায়গা নয়, মোটা মোটা গোল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তিনতলা ইমারত। তারই নীচের তলায় গোল থামগুলো ছাড়া আর কোনও দেওয়াল গাঁথুনি নেই। পুরোটা ফাঁকা। এটাই হল বাসস্ট্যান্ড। প্রশস্ত প্রবেশপথ দিয়ে একসঙ্গে দু-তিনটে বাস যাতায়াত করতে পারে। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে একেকটা নম্বর লাগানো বাস। প্রত্যেক সারির প্রথম বাসটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাদা ট্রাউজার আর সাদা শার্টের ধপধপে উর্দি পরা ফুটফুটে তরুণীরা। কোমরে বেল্ট, গলায় গলবন্ধ। যেন যুঁইফুলের পাপড়ির মধ্যে সযত্নে বসানো কাঞ্চন-কামিনীর মুখ। এরাই বাসের কন্ডাক্টর।

'কত নম্বর বাস যাবে কুয়ান ঝুও?'

নির্মল হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, 'এটায় উঠুন।'

বাসে উঠতে গিয়ে মনে পড়ল, এই হট্টগোলে ডলারের বিনিময়ে উয়ান নেওয়া হয়নি এখনও। তাই তো! মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। এখন কোথায় খুঁজে পাব বিদেশি টাকা বিনিময়ের ব্যাঙ্ক। ইতিউতি দেখতে দেখতে চলেছি ধীরে ধীরে। সামনে একটা ছোট্ট অফিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলছে। এগিয়ে যাই ওদের কাছে।

'ইন হাং যাইনার (ব্যাঙ্ক কোনদিকে)?'

ওরা আমার দিকে তাকাল। তারপর নিজেরা তাকাতাকি করল। বুঝলাম সেই উত্তর-দক্ষিণের সমস্যা। সামনের কাচের মধ্য থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ছেলে আমাকে হাতের ইশারায় ডাকছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ছেলেটি কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে বলল, 'আপনি ব্যাঙ্ক খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ ভাই, ডলার ভাঙিয়ে উয়ান নেব।'

'এই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে গেলেই পেয়ে যাবেন ব্যাঙ্ক অব চায়না।'

'কী করে চিনব ভাই ব্যাঙ্ক অব চায়না? এখানে যে কেউ আমার চিনা বোঝে না, ইংরিজিও বোঝে না।'

ছেলেটি কী একটু ভাবল। তারপর এক টুকরো কাগজে কিছু লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, 'এটা পথে কাউকে দেখাবেন, ব্যাঙ্ক দেখিয়ে দেবে।'

চিনা লিপিতে লেখা। তার চায়না শব্দটা পড়তে পারছি, বাকিটুকু পারছি না। তাহলে ছেলেটি আমার কথা বুঝতে পারছে। ওর কথার মধ্যেও আমি দুয়েকটা চেনা শব্দ পাচ্ছি। ওতেই চলে যাবে।

বাইরে এসে সেই লোকদুটিকেই ওই কাগজটা দেখাতে ওরা একগাল হেসে দুজনে কী বলাবলি করল। তারপর আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল, সোজা গিয়ে ডাইনে।

ব্যাঙ্ক খুঁজে পেলাম। বিদেশি টাকা বিনিময়ের কাউন্টার তিন-চারটি। সবই ধপধপে সাদা উর্দি পরা মহিলার দল। ট্র্যাভেলার্স চেকে সই করে কাচের গর্ত দিয়ে গলিয়ে দিলাম।

একশো ডলারের বিনিময়ে পেলাম ৮২১ উয়ান ৪৬ চিয়াও। ছুটলাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে। ততক্ষণে আগের বাসটা চলে গেছে। কোনটায় উঠব ভাবতে হল না। দণ্ডায়মান উর্দি পরা কাঞ্চন কামিনীদের মুখের মিষ্টি হাসিটুকু দেখে বোঝা যায় এরা সবাই আমাকে চিনে রেখেছে।

'কুয়ান ঝুও যাবেন তো? এটায় উঠুন। সুটকেসটা নীচে দিয়ে দিন।'

বাসের নীচে মালপত্র রাখার আলাদা প্রকোষ্ঠের ঢাকনা খোলাই ছিল। সুটকেস আর ব্যাগ ঢুকিয়ে দিয়ে বাসে উঠে বসলাম।

বাঃ! খাসা ব্যবস্থা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, টিভি, মাইক্রোফোন, খাবার টেবিল, সবই আছে। ময়লা ফেলার ব্যাগও আছে। কাচের জানলায় কাপড়ের পর্দা লাগানো।

কন্ডাক্টর মেয়েটি ৬০ উয়ান নিয়ে একটা টিকিট দিয়ে গেল আর সেইসঙ্গে দিল একটা করে খবরের কাগজ। চিনা কাগজ। ইংরিজি কাগজ এখানে নেই, হয়তো থাকেই না। চিনা খবরের কাগজ পড়ব সে মুরোদ আমার নেই। বিদ্যে তো মোটে এক বছরের। পাতা উল্টে উল্টে দেখছিলাম যদি দু-চারটে চেনা ক্যারেক্টার পাই। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখি। যদি জিজ্ঞেস করে বসে, 'তিনের পাতার খবরটা পড়েছেন তো?' মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে।

চিনের ভূমিতে পা দিয়ে চিনা মেয়ে এই প্রথম দেখছি। দশ-পনেরো মিনিটে যতজন ছেলেকে দেখেছি প্রায় ততজন মেয়েকে দেখেছি। কেউ পরিবহণের কর্মী, কেউবা ব্যাঙ্কের কর্মী। সবার বয়স অনূর্ধ্ব পঁচিশ হবে। শ্বেতবর্ণের উর্দিতে কাঞ্চনতনয়াদের হাসিমাখা চাঁদপানা মুখ, আলাপের লালিত্য, সপ্রতিভ চলার ছন্দ দৃষ্টিকে বশীভূত করে। তবে যে শুনেছি মাত্র ৫০-৬০ বছর আগেও এদের পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে রাখা হত, যাতে দেহের তুলনায় পা দুটো ছোট থাকে, যাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। সমাজের শাসন, মেয়ে মেয়ের মতো থাক, পুরুষের মতো ছোটাছুটি দাপাদাপি একেবারে নয়। সেকালে ওটা নাকি ছিল চিনকন্যাদের সৌন্দর্য।

বিপ্লবের পর মাও সে তুং ওদের পায়ের লোহার বেড়ি খুলে দিয়েছে। ওরা পেয়েছে স্বাধীনতা। পরবর্তী পঁচিশদিনের চিন ভ্রমণে দেখেছি চিনের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেমন এগিয়ে চলেছে।

বাস ছাড়ল ১টা ১৫ মিনিটে। মেয়েটি এক বোতল জল সবাইকে দিয়ে গেল। তবে বুঝি খাবারও আসবে। আশায় আশায় বসে বসে খাবার টেবিলের ওপর বোতলটা রেখে নাড়াচাড়া করছিলাম। খাবার আর আসেনি।

চিনের গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি। যে পথ দিয়ে বাস চলেছে তাতে সাদা দাগ দেওয়া ছটি গলি, তিনটি গাড়ি যাওয়ার জন্য আর তিনটি আসার জন্য। মসৃণ পথ। ডায়েরি লেখার কাজ বাসে বসে বেশ চলে যাচ্ছে। পথের দুধারে কখনও ধানখেত কখনও সবজিখেত। মাঝে মাঝে লোকালয়, কলকারখানা। কোথাও পথে নির্মাণের কাজ চলছে।

প্রায় দুঘণ্টা পর লোকালয়ের বাইরে বাস থামল একটা প্রশস্ত জায়গায়। কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। এখানে বাস পাল্টাতে হবে। যাত্রীরা একে একে নেমে যে যার গন্তব্যস্থান অনুসারে অপেক্ষমাণ একেকটা বাসে উঠে পড়ছে। কন্ডাক্টরনন্দিনী আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

আমি বললাম, 'কুয়াং ছুয়ো রেলস্টেশনের কাছে থাকতে চাই, কাল ট্রেনে সাংহাই যাব।'

ও ঠিক বুঝতে পারছে না, আমাকে কোন বাসে তুলে দেবে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এগিয়ে এল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।'

ওদের সঙ্গে বাসে উঠলাম।

৩

বাস থামল একটি লোকালয়ে। আমি ওদের সঙ্গে নামলাম। ওরা দুজনে আমার দুটো বোঝা তুলে নিল। আমার কোনওরকম আপত্তি শুনল না। চলতে চলতে আলাপ হল। ছেলেটির নাম লি কুয়াং আর মেয়েটির নাম ছাও উয়ানউয়ান।

'তোমরা কে কী করো?'

লি কুয়াং বলল, 'আমরা দুজনেই সাইহাই মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ছি।'

'তোমরা অর্থনীতি পড়ছ! বাঃ! আমি অর্থনীতি পড়াই।'

'তাই বুঝি? কী ভালো'। দুজনের মুখেই হাসি।

'আপনি ভারত থেকে এসেছেন?' ছাও উয়ানউয়ান জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'ভারতের কোন শহর?'

'কলকাতা।'

'কলকাতা! ইস, আমার কী যেতে ইচ্ছে করে।' ছাওয়ের মুখে উচ্ছ্বাস।

সামনে একটা হোটেল।

'আপনি কীরকম হোটেল চান?' লি জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'যতটা কমে সম্ভব।'

'আপনি দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।'

ওরা দুজনে হোটেলের ভেতরে গেল। ফিরে এসে বলল, 'অনেক দাম, চলুন।'

লি বলল, 'আচ্ছা, কয়েকবছর আগে ইকনমিক্সে নোবেল প্রাইজ পেলেন, কী যেন নাম, তিনি তো ভারতের?'

'অমর্ত্য সেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সেন, মনে পড়েছে। উনি ভারতীয় না?'

'হ্যাঁ।'

ছাও উয়ান বলল, 'আপনি তাকে দেখেছেন?'

আবার একটা হোটেল দেখে দাঁড়ানো হল। ওরা দুজন ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল, 'এরও খুব দাম বেশি। চলুন।'

এগিয়ে চললাম। এমনি করে একটার পর একটা হোটেল দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। ওদের পছন্দ হচ্ছে না। ভাড়া কত তা আমাকে বলছে না, সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিচ্ছে। প্রায় দুঘণ্টা হাঁটা হল। কমদামের হোটেল আর পাওয়া যাচ্ছে না।

পথে একটি লোকের সঙ্গে লি-র কী কথা হল। আমরা তাকে অনুসরণ করে চললাম। হয়তো হোটেলের দালাল হবে। এক পাঁচতলা বাড়ির সামনে এসে থামলাম। লোকটি ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'লি, এ তো অনেক বেশিদামের হোটেল মনে হচ্ছে।'

লি বলল, 'ও তো বলছে ভাড়া কম, আপনি দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।'

লি ঘুরে এসে বলল, 'সত্যিই ভাড়া কম, মাত্র ১০০ উয়ান।'

হোটেলের নাম পেট্রোলিয়াম হোটেল। চিনা ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম প্যারেন্ট কোম্পানি ব্যবসার স্বার্থে ক্রেতাদের সুবিধার জন্য বানিয়েছে এই হোটেল। সাধারণকেও ভাড়া দেয়। তবে সরাসরি এলে হবে না। কোম্পানির কোনও কর্মীর মাধ্যমে আসতে হবে। লি-র সঙ্গে পথে যার কথা হয়েছিল সে এই তেল কোম্পানির একজন কর্মচারী।

'ভালোই হবে মনে হচ্ছে। চলুন ঘর দেখে আসি।'

তিনজনে লিফটে উঠলাম আর্দালির সঙ্গে।

বড় ঘর। দুজনে থাকার মতো খাট, বিছানা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, টিভি, টেলিফোন সবই আছে, একটি গোল টেবিলের ওপর জগে গরম জল, লাল-সবুজ দু প্যাকেট চা পাতা, কেটলি।

'জল চব্বিশ ঘণ্টা থাকে তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।' আর্দালি জবাব দিল।

লি জিজ্ঞেস করল, 'ঘর পছন্দ তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, খুব ভালো ঘর। তোমাকে ধন্যবাদ।'

'তবে চলুন, আমরা নীচে যাই। জিনিসপত্র এখানেই থাকুক।'

নীচে এসে অভ্যর্থনা টেবিলে একদিনের ভাড়া ১০০ উয়ান আর নিয়মমাফিক

চাবির জন্য জমা ১০০ উয়ান দিয়ে চাবি নিয়ে লিকে বললাম, 'তুমি লক্ষ্মীটি এবার সাংহাইয়ের টিকিট কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।'

পাশেই একটা ছোট্ট ঘরে এক পর্যটন কোম্পানির অফিস। লি তাদের সঙ্গে কথা বলে বলল, 'আগামী তিনদিনের জন্য সাংহাই যাওয়ার কোনও টিকিট পাওয়া যাবে না। পেইচিংয়ের টিকিট হবে।'

তার মানে তিনদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে। সময় নষ্ট। লিকে বললাম, 'ঠিক আছে, পেইচিংয়ের টিকিট কাটো।'

ছাও উয়ান বলল, 'সেটাই ভালো।পরে পেইচিং থেকে সাংহাই আসতে পারবেন।'

পেইচিংয়ের ভাড়া ২১৯ উয়ান আর এজেন্টের পারিশ্রমিক ৫০ উয়ান দিয়ে দিলাম। এজেন্ট জানাল রাত ৯টায় আমার ঘরে টিকিট পৌঁছে দেবে।

'তাহলে আপনার সব ব্যবস্থা হয়েছে তো?' লি জিজ্ঞেস করল। .

'হ্যাঁ, হয়েছে। তোমরা দুজন আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ।'

'তাহলে এখন চলুন আপনাকে ভালো খাবার হোটেল দেখিয়ে দিই। আপনার তো খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।'

চলতে চলতে লি বলল, 'এই পথ দিয়ে সোজা হাঁটলে স্টেশন পাবেন। পাঁচ মিনিটের পথ।

একটা রেস্টুরেন্টে এলাম।

'কী খাবেন বলুন।'

'আমি তো এখানকার কোনও খাবার চিনব না। তোমাদের পছন্দমতো নাও। আমার খাওয়ায় কোনও বাছবিচার নেই। খাবার জিনিস হলেই হল।'

নিজের পছন্দমতো খাবার অর্ডার দিয়ে আমাকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এই তিনদিন এখানেই খাবেন, দাম কম, খাবার বেশ ভালো।'

খাবার এল একজনের। লি বলল, 'এবার আমরা যাই?'

'সে কী! তোমরা খাবে না?'

'না, আমাদের এখন অনেক দূরে যেতে হবে। বাসে দুঘণ্টার পথ। মা চিন্তা করবেন। যাচ্ছি।'

'সে কী! তোমরা এতক্ষণ ধরে আমার জন্য কষ্ট করলে, আর এখন না খেয়ে চলে যাবে? একটু খেয়ে যাও।'

ছাও উয়ান বলল, 'না, আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে। আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা যাচ্ছি।'

'যাই চিয়ান (বিদায়)।'

ওরা চলে গেল। আমি রেস্টুরেন্টের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কোনও টেবিল ফাঁকা যাচ্ছে না। কাঁটাচামচের টুংটাং শব্দ নেই। দুটি শলাকা নিয়ে নিঃশব্দে হাত ওঠানামা চলছে। খাদ্য পানীয় যাবতীয় কিছু মুখগহ্বরে চালান হয়ে যাচ্ছে লম্বা শলাকাদুটির সাহায্যে। দেখতে ভারি মজা লাগে।

হংকংয়ে রেস্টুরেন্টে কদিন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শলাকার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হল না। অনেক চেষ্টা করে দুই শলাকার মধ্যে আবদ্ধ করে কয়েক গণ্ডা

ভাত তুলতে পেরেছিলাম। অনেক সতর্কতার সঙ্গে কাঠিদুটি মুখগহ্বরের সমান উচ্চতায় আনতে আনতে ভাতের সংখ্যা দাঁড়াল দুই। সেই থেকে আর ওপথে পা দিইনি।

যেখান থেকে খাবার দেওয়া হচ্ছে সেখানে একটা বড় প্লেটের ওপর অনেক কাঁটাচামচ রাখা আছে। দুটো কাঁটাচামচ নিয়ে এলাম। কিন্তু জল কোথাও দেখছি না। কোনও টেবিলেই জল দেয়নি। নিজেদের নিয়ে নেওয়ার জন্য জল কোথাও রাখা আছে কিনা তাও দেখছি না। তার মানে জল এখানে পাওয়া যাবে না।

খাওয়া শেষ করে পথে নামলাম। এই হল অতীতের ক্যান্টন। ইংরেজ বণিকদের আফিংয়ের চোরাকারবারের প্রধান ঘাঁটি ছিল ক্যান্টন বন্দর। মাঞ্চু রাজা মজুত করা সব আফিং নষ্ট করে দিয়েছিল। তার ফলে হল আফিং যুদ্ধ। সেই পুরাতনী ক্যান্টন এখন আধুনিকা কুয়াং ছুয়ো। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। পথের দুপাশে বহুতল ইমারত। আকর্ষণীয় দেশি-বিদেশি পণ্যে সাজানো বড় বড় দোকানের শোরুম। যানবাহন চলাচলে ব্যস্ত রাজপথ।

ঘুরতে ঘুরতে পেলাম এক ফলের বাজার। দাম বেশ সস্তাই মনে হচ্ছে। জলও পাওয়া যাচ্ছে। দু বোতল জল কিনে হোটেলে ফিরে এলাম।

চিনযাত্রার আগে অনেক শুভানুধ্যায়ী মুশলধারে বাণী ছেড়েছিলেন, চিনে হোটেলে খুব অসুবিধে হবে। সারাদিনে একবার জল দেবে, কমোড খুব কম হোটেলেই থাকে, ওদের দেশি কায়দায় পায়খানা, তাতে খুব অসুবিধে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই বাথরুমটা ভালো করে নিরীক্ষা করে দেখছিলাম। কমোড আছে, কমোড ফ্লাশ আছে, কলে জল আছে। তোয়ালে, সাবান, শ্যাম্পু, বডি লোশন সবই আছে। উপরন্তু কিছু অতিরিক্ত জিনিস আছে, যেগুলো সাধারণ কোনও হোটেলে থাকে না। পেস্ট, ব্রাশ এবং মাথায় জল না লাগিয়ে স্নান করবার জন্য প্লাস্টিকের টুপি। নেই শুধু বাথটব। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করতে হবে।

ঘরে এসে চেয়ারে বসে জগ থেকে গরম জল ঢাললাম পোর্সেলিনের কেটলিটায়। একটা চায়ের প্যাকেট ছিঁড়ে গুঁড়ো ঢেলে দিলাম তার মধ্যে। জীবনে চায়ের স্বাদ নিইনি কোনওদিন। আজ প্রথম হবে চা সেবন, নিজে হাতে তৈরি করে। স্মরণীয় দিন বটে। হঠাৎ নজরে পড়ল টেবিলের নীচে কী যেন একটা সাদা সাদা। তুলে দেখি দু জোড়া চপ্পল। দুধসাদা রং। কোনও ওজন নেই। কাগজের মতো হালকা। পায়ে গলিয়ে দিলাম। কার্পেটের ওপর দু-চার পা এগিয়ে দেখি পায়ে চপ্পল নেই, সে পিছনে পড়ে আছে। এমন সুন্দর জিনিস দুটো টেবিলের তলায় কেন? তুলে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

এক কাপ চা ছেঁকে নিয়ে সবে এক চুমুক দিয়েছি, এমন সময় দরজায় শব্দ টক টক টক। গুনগুন করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দরজা খুলে দিলাম। একটি ছেলে একটি খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নিন ট্রেনের টিকিট। পরশু সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে ট্রেন। আপনি একটু আগে স্টেশনে চলে যাবেন।'

দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তমনে বসে টিকিটটা উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। শুধুমাত্র ট্রেন ছাড়ার তারিখ এবং সময় ইংরিজি হরফে, বাকি সব চিনা অক্ষরে লেখা। অক্ষর তো

নয় লিপি, ছবি বলা যায়, পিক্টোগ্রাফ। একেকটা শব্দই একেকটা লিপি। চিনা ভাষায় কোনও অক্ষর নেই, বর্ণমালা নেই। বর্ণমালা থাকলে বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে শব্দ বানানো যায়, লেখা যায়, পড়া যায়। চিনা ভাষায় তার উপায় নেই। মোট তিরিশ হাজার লিপি নাকি আছে। বুঝুন একবার। তিরিশ হাজার লিপি মনে রাখতে পারলে তবে চিনা ভাষা গড়গড় করে পড়া যায়, লেখা যায়। চিন দেশের মানুষ কজন তা পারে? তিরিশ হাজারের মধ্যে তিন হাজার লিপি শিখতে পারলে নাকি দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে নেওয়া যায়। সেও কি সহজ ব্যাপার! আজ দশটা লিপি শিখলে কাল দুটো মনে থাকবে, পরশুদিন একটাও না। রোজ লিখে লিখে অভ্যেস করলে তবে লিপি মনে রাখা যায়, না হলে ভুলে যেতে হয়। তার ওপর আছে বয়সের বোঝা। এই বয়সে নতুন শেখার উদ্যম কি আর থাকে!

ব্যাগ থেকে নোটবই আর প্র্যাক্টিক্যাল রিডার বের করলাম। লিপি মিলিয়ে মিলিয়ে টিকিটটা পড়বার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় দরজায় আবার শব্দ— টক টক টক।

দরজা খুললাম। এক কাঞ্চননন্দিনী দাঁড়িয়ে।

'চিন চিং (অনুগ্রহ করে ভেতরে এসো)।'

লাবণ্যময়ী মুখমণ্ডল, কটিদেশ আলম্বিত ঘন কালো কেশরাজি পিঠের ওপর বিন্যস্ত। কালো জামা, চিনদেশীয় পায়জামা। দৃষ্টিতে দৃষ্টিস্থাপন করলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, যেন সম্মোহনী ক্ষমতা আছে।

'নি হাও?' (কেমন আছেন?)

চিনসমাজে দুই চেনা বা অচেনা ব্যক্তির প্রথম সাক্ষাতে এটাই প্রথম সম্ভাষণ। প্রত্যুত্তরেও তাই বলতে হয়।

'নি হাও।'

খুব ক্ষীণস্বরে মেয়েটি কী যেন বলল, বুঝতে পারলাম না। সে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে আমাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বিছানায় বসল। তারপর হাতের ইশারায় আমাকে ডাকল। অনুমান করলাম কোনও হোটেলকর্মী হবে। নীচে অভ্যর্থনা টেবিলে দুজনকে দেখেছি। এ হয়তো তৃতীয় আরেকজন। কিন্তু তাদের সঙ্গে এর আচরণে যেন একটু পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'বলো, কী দরকার তোমার।'

তার হাতের ইঙ্গিতে বুঝলাম, আমাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে।

'ঠিক আছে, দরজা বন্ধ করছি, তোমার কী দরকার বলো আগে।'

তখনও তার মুখে কোনও কথা নেই। আমাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল।

এবার যেন সুন্দরী তোমার রূপের আড়ালে আসল রূপটা দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। তোমার পাশে বসলেই যে তোমার পাতা জালে জড়িয়ে যাব।

মোলায়েম সুরে বললাম, 'হ্যাঁ, বসছি, বলো না তুমি কী জন্য এসেছ।'

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সেই মুহূর্তে আমি মনে মনে শঙ্কিত হলাম। যদি ও নিজেই দরজা বন্ধ করে দেয় তখন কী করব। আমার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

এখন আর কোনও উপায় নেই। ওর পাতা ফাঁদে বোধহয় জড়িয়ে পড়লাম।

মেয়েটি আস্তে আস্তে দরজার বাইরে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

চিন ভ্রমণের প্রথম রজনীতেই একেবারে ঘরের মধ্যে এমন রমণীর আবির্ভাব ঘটবে ভাবতেই পারিনি। হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা দ্রুত হচ্ছে, গা শিউরে উঠছে। কী করা উচিত— নীচে গিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসব, নাকি ব্যাপারটা একেবারে চেপে যাব, বুঝতে পারছি না। কখনও বিছানায় বসছি, কখনও শুয়ে পড়ছি, কখনও পায়চারি করছি।

অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, অভিযোগ জানাব। তা না হলে, বেশি রাত্রে আবার এসে উৎপাত করতে পারে। দরজা খুলে বাইরে এলাম। কেউ কোথাও নেই। নিরাপত্তাকর্মীও তার চেয়ারে নেই। নীচে নেমে এলাম। অভ্যর্থনা টেবিলে আগের মেয়েদুটিই আছে।

'তোমরা কাউকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলে?'

ওদের একজন বলল, 'হ্যাঁ, একটি ছেলে আপনার টিকিট দিতে গিয়েছিল।'

'তারপর কোনও মেয়েকে পাঠিয়েছিলে?'

'কই না তো। কেন, কে গিয়েছিল?'

আমি মেয়েটির শারীরিক বর্ণনা দিয়ে সব বললাম।

প্রথম মেয়েটি বলল, 'আমরা জানি না তো।'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললাম, 'জানো না মানে? তোমাদের সামনে দিয়ে বাইরের লোক হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল, ওপরে উঠল, আমার ঘরে ঢুকে গেল। আর তোমরা বলছ, জানি না। তাহলে এখানে নিরাপত্তা কোথায়?'

ওরা দুজনেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। লাউঞ্জে সামনের সোফায় বসে ছিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তিনি মেয়েদুটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ম্যানেজারকে ফোন করো।'

ওদের একজন ফোন তুলে নম্বরের বোতাম টিপে ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'আপনি কথা বলুন।'

আমি ফোন ধরলাম।

'হ্যালো! নি হাও।'

'নি হাও।'

'আমি একজন ভারতীয়। আজ বিকেলে আপনার হোটেলে এসেছি। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। আপনি দয়া করে এক্ষুনি একবার আসতে পারবেন?'

'বলুন না কী হয়েছে?'

'ফোনে সব বলা যাবে না। আপনি দয়া করে একবার আসুন।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

ম্যানেজার লিউ চুন, দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন। আমি তাঁকে ঘটনার আদ্যন্ত বিবরণ দিলাম। সব শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় নিযুক্ত নিরাপত্তা কর্মীকে

ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনজনকে খুব বকাবকি করলেন। আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত। আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও এ ঘটনা ঘটবে না। আপনার কোনও ভয় নেই।'

স্বস্তি অনুভব করে ওপরে গেলাম।

পরদিন সকালে শরীরচর্চা করে চিড়েভাজা আর চানাচুর দিয়ে প্রাতরাশ করে নীচে নেমে এলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম রেলস্টেশনে। এটা খুব ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। কাল সকালেই এখানে আসতে হবে।

বেশ বড় স্টেশন। স্টেশনের বাইরে প্রশস্ত শান বাঁধানো চত্বর। সেখানে মানুষের ভিড়। অগণিত মানুষ মেঝের ওপর শুয়ে বসে আছে। ছেঁড়া কাগজ, তরমুজের খোসা, লিচুর খোসা চারদিকে ছড়ানো। অনেক সাবধানে এঁকেবেঁকে ধীর গতিতে চলতে চলতে ভিড় কাটিয়ে এলাম স্টেশনের অলিন্দে। লম্বা অলিন্দে যাত্রীতে যাত্রীতে ছয়লাপ। বসার জন্য বেঞ্চ বা চেয়ার নেই। যাত্রীরা মেঝের ওপর বসে পড়েছে, অনেকে শুয়েও পড়েছে। ভীষণ গরম। যাত্রীদের হাতে হাতে হাতপাখা ঘুরছে। ওখানে চলা দায়।

ভিড়ের মধ্যে বেশকিছু পুলিশ দেখা যাচ্ছে। হাতে লাঠিবন্দুক নেই। পথচারীদের নানান জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা পুলিশ ভ্যান টহল দিয়ে যাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকার জন্য দুটো গেট। দুটো গেটেই লম্বা লাইন লেগেছে। কাল এই গেট দিয়েই ঢুকতে হবে আমাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, কতখানি কসরত করতে হবে। গেটের রক্ষী বসে আছে টঙের ওপর। সেখানে বসে বসেই সে টিকিট দেখে দেখে একজন একজন করে ঢুকতে দিচ্ছে। গেটের মুখে খুব ঠেলাঠেলি হচ্ছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলাম। চওড়া রাস্তা, সাদা দাগ টেনে ছটা গলি বানানো হয়েছে। তিনটে গলি গাড়ি যাওয়ার জন্য আর তিনটে আসার জন্য। উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। যেখান থেকে খুশি রাস্তা পার হওয়া চলবে না। পারাপারের জন্য আছে সেতু আর সুড়ঙ্গপথ। সুড়ঙ্গপথের অনেক শাখাপ্রশাখা। কোন পথে ঢুকে কোন পথ দিয়ে বের হলে রাস্তার এপার থেকে ওপারে পৌঁছনো যাবে তা জানা থাকা দরকার। তা না হলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাওয়ার পর দেখা যাবে পথের একপাশেই রয়ে গেছি। তাতেই বা ক্ষতি কী! দেখা তো যাবে অনেক কিছু। প্রচুর দোকান সুড়ঙ্গপথে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

দেখতে দেখতে সময় বেশ কেটে যায়। কতরকমের দোকান আছে। তার মধ্যে কাটা ফলেরও দোকান যেমন আছে, ভাত, মাছ, মাংসের দোকানও আছে অনেক। মাধ্যাহ্নিকের কাজটা সেরেই ফেললাম মাংস আর ভাত দিয়ে। কিসের মাংস? চিনারা খায় না এমন জন্তু-জানোয়ার মায় কীটপতঙ্গ নাকি দুনিয়ায় নেই। থাক সে কথা। সে বিচারের সময় পাওয়া যাবে পেইচিংয়ে পৌঁছিয়ে। এখন তো খেয়ে নিই। খাওয়ার আগে জন্তুর নাম না জানাই ভালো।

কাল ট্রেনে যেতে হবে। একরাত কাটবে ট্রেনে। পথে কিছু কিনতে পাওয়া যাবে কিনা জানা নেই। কিছু ফল, রুটি এবং জল সংগ্রহ করে নিয়ে সন্ধেয় হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল সাতটার আগেই জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে এলাম। ঘরভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিলাম কাল রাতেই। শুধু নিয়মমাফিক চাবির জন্য জমা ১০০ উয়ান ফেরত পাওয়া যাবে যাওয়ার ঠিক আগে। সেটা ফেরত নিয়ে সাতটাতেই বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশে। মাঝপথে এক মালবাহক এসে পথ আটকাল। সে আমার মাল বয়ে নিয়ে যেতে চায়। তার সঙ্গে আছে দু চাকাওয়ালা মালবহনের ঠেলা, ঠিক যেমনটি হাওড়া-শিয়ালদায় দেখা যায়।

'কত নেবে?'

সে হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে বলল, 'উ।' আমি তিন আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'সান।' তাতেই সে রাজি হয়ে গেল।

এই মালবাহকদের স্টেশনের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। সুতরাং স্টেশনের বাইরে মালপত্র নিয়ে তাকে বিদায় দিতে হল।

এইবার সেই বিশাল লাইনে দাঁড়াতে হবে, যা কাল দেখে গেছি। লাঞ্চব্যাগটা কাঁধে নিয়ে আর চাকা লাগানো সুটকেসটা টানতে টানতে ভিড়ের মধ্যে একটু একটু ঢুকবার চেষ্টা করলাম। সকলেই আমাকে দেখছে। সামনের লোক আমাকে পথ ছেড়ে দিল। একটু এগোলাম। আবার সামনের লোক পথ ছেড়ে দিল। আবার একটু এগোলাম। সবই আমার ধুতি-পাঞ্জাবির মহিমা। ব্যাপারটা মন্দ নয়। একটু একটু করে একেবারে লাইনের শেষ থেকে সামনে চলে এলাম। টিকিট চেকার অল্প করে গেটটা খুলে দিল যাতে শুধু আমি ঢুকতে পারি। ভেতরে ঢুকে গেলাম। টিকিট চেকার কিছু বলল না, টিকিট দেখতে চাইল না। গুটিগুটি এগিয়ে চললাম যেদিকে প্ল্যাটফর্ম সেইদিকে। গেটে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। চৈনিক জামা পায়জামা চপ্পল নয়, প্যান্ট শার্ট শু্য পরনে, সুদর্শনা কাঞ্চনকামিনী চলনেবচনে অত্যন্ত সাবলীল সপ্রতিভ। একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ট্রেন আপনার?'

আমি টিকিটটা দেখালাম।

পাশে এসকালেটর দেখিয়ে দিয়ে মিষ্টি হাসি মিশিয়ে বলল, 'দোতলায় চলে যান, চোদ্দ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।'

ওপরে উঠে চোদ্দ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে যাত্রীদের বসার ঘরে গিয়ে বসলাম। অনেক বড় ঘর, দু-তিনশো লোক বসতে পারবে। চার সারিতে লম্বা লম্বা বেঞ্চ পাতা। মাথার ওপর কোনও পাখা নেই। একদিকের দেওয়ালে লাগানো আছে তিনটে পাখা, তার মধ্যে একটা ঘুরছে বাকি দুটো স্তব্ধ। একেবারে অকেজো কিনা জানি না। হলঘরে ঢোকার মুখে প্রস্রাবখানা, খুব নোংরা, দুর্গন্ধ আসছে। এর পাশেই পায়খানা। তাতে আধা আব্রু আছে। দাঁড়ালে কোমর পর্যন্ত দেখা যায়। বসলে মাথা দেখা যায়।

ট্রেন ছাড়তে এখনও দুঘণ্টা দেরি। প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার গেটে একটা বৈদ্যুতিন বোর্ড লাগানো। তাতে কিছু লেখা আছে। অচেনা শব্দগুলো পড়বার জন্য চাইনিজ প্রাইমারি রিডার আর নোটবই বের করলাম। পাশে এক মহিলা বসে। তাঁর সাহায্য নিচ্ছিলাম।

দেখতে দেখতে ঘরটা যাত্রীবোঝাই হয়ে গেল। গেট খুলল ১০টা ২৫ মিনিটে। প্ল্যাটফর্মে কোনও কুলি নেই, ফেরিওয়ালাদের দাপাদাপি নেই। একমাত্র আমাদের দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের কোনও শহরে প্ল্যাটফর্মে কুলি দেখিনি। লম্বা

প্ল্যাটফর্মটাতে মাত্র চারজন ফেরিওয়ালা ট্রলিতে করে প্যাকেট খাবার বিক্রি করছিল। গোটা প্ল্যাটফর্মে কোথাও একটুকরো ময়লা দেখছি না। ১৭ নম্বর কোচে ১০ নম্বর সিট খুঁজে নিয়ে বসলাম।

৪

ট্রেন ছাড়ল ১০ টা ৫৭ মিনিটে। দুপাশে বসার সিটে একদিকে তিনজন, আরেকদিকে দুজন বসতে পারে। এটা সর্বসাধারণের জন্য কোচ, শোওয়ার ব্যবস্থা নেই। বসেই যেতে হবে। তবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এরকম কোচেই আমি টিকিট চেয়েছিলাম। ওপরে মালপত্র রাখার সব জায়গা দখল হয়ে গেছে। সিটের নীচেও মালপত্র রাখা যায় না। দুটো করে মুখোমুখি বসার সিটের মাঝখানে একটা করে খাওয়ার টেবিল আছে। তার নীচে কোনওরকমে সুটকেস আর ব্যাগটা রাখা গেল কিন্তু পা রাখার জায়গা আর রইল না। জানলার পাশে আমার জায়গা, বেশ কষ্ট করে বসতে হল। বসার জন্য আসন সব সংরক্ষিত কিন্তু বহু মানুষ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে চলার পথে।

একজন বিক্রেতা ছোট্ট ট্রলিতে করে খাবার হেঁকে যাচ্ছিল। ওর পরনে রেলকর্মীদের উর্দি, বুকে নাম লেখা তকমা লাগানো। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার পথে এরকম তিনজন বিক্রেতার দেখা পাওয়া গিয়েছিল।

বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে সবার খাওয়া শুরু হল। খাওয়া শেষে বর্জ্যগুলো টেবিলের ওপর রাখা ট্রের মধ্যে রাখছিল সবাই। কাগজে হাত-মুখ মুছে তাও ফেলছিল ট্রের মধ্যে। পরে একজন রেলকর্মী ট্রেগুলো নিয়ে পরিষ্কার ট্রে রেখে গেল। একজন কোচের মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছিল মাঝে মাঝে, তার পিছে পিছে আরেকজন ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছিল। এদের সবার বুকে নাম লেখা তকমা আঁটা।

আমার পাশে বসেছে এক যুবক। ইংরিজি আর চিনা ভাষার মিশ্রণে ওর সঙ্গে আলাপ চলছিল। দুজনে দুজনকে মনের ভাব বোঝাতে অদম্য উৎসাহে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ও ভালো ইংরিজি বলতে পারে না আর আমি ভালো চিনা ভাষা বলতে পারি না। বলা যেতে পারে ওর ইংরিজি মিশ্রিত চিনা চিংরিজি বনাম আমার চিনা মিশ্রিত ইংরিজি ইংরিচিন ভাষায় তুমুল সংঘর্ষ চলছিল। পরাজয়ের মুখে আমি আমার নোটবই বের করলাম, ছেলেটি দেখে তো অবাক।

'শুধু আমাদের দেশে বেড়াতে আসবেন বলে এই বয়সে আমাদের ভাষা শিখেছেন?'

'শিখতে আর পারলাম কোথায়। গোটাকয়েক শব্দ শিখেছি মাত্র। তাতে যে কাজ চলছে না তা তো দেখতেই পাচ্ছ। তুমি গোটাকয়েক শব্দ লিখে দাও তো, যেগুলো এ কদিন খুব দরকার লাগবে।'

কটা অজানা লিপি ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম।

ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কী?'

আমি নাম বললাম। কিন্তু ও বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চিনা

নাম কী?'

'এই তো লজ্জায় ফেললে। এই বুড়ো বয়সে নিজের নামটাই বলতে পারব না। এটাই তুমি শিখিয়ে দাও।'

'ওরে বাবা, এ আমি পারব না। আপনি আপনার ইংরিজি নাম আর ঠিকানা লিখে দিন।'

চিনা ভাষায় নিজের নাম বলা বেশ ঝকমারি ব্যাপার, লেখা তো দূর অস্ত। আপনি কিছুদিন চিনা ভাষা শিখেছেন বলে মোটেই ভাববেন না যেন, গড়গড় করে নামটা লিখে দিতে পারবেন। আপনার নাম যদি সমর হয়, ওই শেষের 'র' ওরা উচ্চারণ করতে পারবে না, লিখতেও পারবে না। আপনাকে যদি কোনও চিনদেশের লোক জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন, আপনি বলবেন বেইজিং যাব, সে কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পারবে না। এবার আপনি বেইজিং শব্দটাকে ইংরিজি হরফে লিখে দিন, তখন সে বলবে, বুঝেছি, পেইচিং যাবেন। ইংরিজি বানানটা ঠিকই আছে, বেইজিং (BEIJING) ওরা পড়বে পেইচিং। Mao Zedong শব্দটা আপনি পড়বেন 'মাও জে দং', ওরা পড়বে 'মাও সে তুং'। ইংরিজি বানানটা কিন্তু ওরা একই লিখবে। আমার চিনা মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম, 'চিনে যাচ্ছি, নামটা লিখতে শিখিয়ে দেবেন না?'

তিনি বললেন, 'একবছরে নাম লিখতে শেখা যায় না। চিন ঘুরে আসুন, তারপর সামনের বছর হবে। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে মুখে বলবেন না, ইংরিজিতে লিখে দেবেন। ওরা ওদের মতো করে পড়ে নেবে।'

আমি চিঠি লেখার কাগজের প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে ওর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কী?'

'লুও মিন।'

'কী করো?'

'শাও কুয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার নিয়ে পড়ছি।'

একটা বড় স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। শান শা ছাং। প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর ভিড় বেশি নেই। অল্প কয়েকজন মহিলা হকার উনুন জ্বেলে রান্না করছে। অনেকে নেমে গেল খাবার কিনতে। মুঘলসরাই বা কানপুর স্টেশনে যেমন আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে কড়াই থেকে সদ্য নামানো গরম গরম পুরি নিয়ে আসি, এখানকার দৃশ্যটা সেইরকম অনেকটা। মাংস, ডিম, ভাত, নুডুল, প্যাকেট খাবার কিনে আনছে সবাই। প্রায় নিঃশব্দে কাজ চলছে এখানে।

ট্রেন ছাড়ল। তখনই সবার খাওয়া শুরু হয়ে গেল প্রায় একসঙ্গে। মাংসের ঝোল নয়। ভাজা মাংস। মাংসের টুকরোগুলো বেশ বড় বড়, খুব মোটা। কোন জন্তুর ঠ্যাং বোঝা যাচ্ছে না, শুয়োর বা গরুর ঠ্যাঙের থেকে মোটা। দুহাত দিয়ে দুপ্রান্ত ধরে সবাই খাচ্ছিল। খাওয়া শেষে হাড়গুলো ফেলছিল টেবিলের ওপর রাখা ট্রের মধ্যে। গাড়ির মধ্যে রেলকর্মী হকাররাও ট্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছিল ঠান্ডা চা, বরফ চা, পেপসি, ফলের রস আরও অনেকরকমের খাবার।

দাঁড়িয়ে যাওয়া যাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বসে যাওয়া যাত্রীদের খাওয়া শেষ হতেই দাঁড়ানো যাত্রীরা সবাই বসে পড়ল। কেউ মেঝেতে কাগজ পেতে, কেউবা

ছোট টুলের ওপর। অনেকেই ছোট ছোট টুল সঙ্গে নিয়ে এসেছে। যারা আনেনি, তারা হকারদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। তার মানে এইভাবে ট্রেনে যাতায়াতের রীতি প্রচলিত।

ট্রেন চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। আমি বসেছি বাঁপাশে। সুতরাং সূর্য আমার দিকেই ছিল। পর্দা সরানো যায়নি। তাই সারাদিন ধরে আমার মনোযোগ ছিল যাত্রীদের দিকে, এরা কী করে, কী বলে, কী খায়, কেমন করে খায়, এইসব লক্ষ করছিলাম। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। পর্দা সরিয়ে দিয়ে বসেছি। গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে ট্রেন। ছোট ছোট টুকরো জমি। আল দিয়ে সীমানা টানা হয়েছে। মোষ দিয়ে লাঙল দেওয়া হচ্ছে। আমাদের গ্রামের মতোই। কখনও অনুর্বর জমির পাশ দিয়ে, কখনও ছোট ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলেছি।

রাতটা কেটে গেল কোনওরকমে। এবার আমাকে উঠতে হল। লুও মিন উঠে দাঁড়াল, তবেই আমি উঠতে পারলাম। যারা পথে শুয়ে-বসে ছিল, তারা আমায় পথ করে দিল। কোচের শেষপ্রান্তে একটা টয়লেটের সন্ধান পাওয়া গেল। ওদেশীয় কায়দায়, কমোড নেই, শুধু মেঝেতে একটা বড় গোল গর্ত। বসার জন্য পাদানি নেই। এরা জলশৌচ করে না, পশ্চিমের মানুষের মতো কাগজ ব্যবহার করে। চারদিকে ছেঁড়া কাগজ ছড়ানো। দুর্গন্ধে ভেতরে থাকা সম্ভব হল না। পেইচিং পৌঁছিয়ে হোটেলের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রাতঃক্রিয়া সমাপনের কোনও সম্ভাবনা রইল না। ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। লুও মিনের সঙ্গে চিনা ভাষা চর্চা শুরু করে দিলাম।

একটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কী?'

'শিয়া শাও ছুন।'

সাহস পেয়ে শিয়াও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে ভাষাচর্চায়।

'আচ্ছা, লিখুন তো পেইচিং।'

আমি লিখে দিলাম।

'বাঃ! বেশ সুন্দর লিখেছেন তো।'

'আচ্ছা, এবার লিখুন, তিয়ান-আন মেন।'

তাও লিখে দিলাম।

লিও বলল, 'বলুন, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ-এর চাইনিজ কী হবে?'

'হান উ্য।'

'হাও (বেশ)। এবার হান উ্য লিখুন দেখি।'

ভেবে ভেবে লিখলাম। 'দেখো তো ঠিক হয়েছে নাকি?'

'হান হাও (খুব সুন্দর হয়েছে)!' ওরা দুজনে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। শিয়া বলল, 'আপনি একশোতে একশো পেয়েছেন।'

যাত্রীদের মধ্যে ভীষণ কৌতূহল। কাছাকাছি যারা বসে ছিল তারা মজা উপভোগ করছিল। যেন এক মজার খেলা হচ্ছে। অনেকে উঠে এসেছে। সবাই খেলায় যোগ দিতে চায়। একেকজন একেকটা শব্দ বলে আর আমি লিখে দিই।

একজন বলল, 'লিখুন তো মাও সে তুং।'

'এই রে, এতে তো চারটে হানচি (চাইনিজ ক্যারেক্টার) লাগে। আমার একটা মনে আছে, আর তিনটে ভুলে গেছি।'

'এবার আপনি ফেল।' সকলে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

ট্রেনের গতি মন্থর হল। একটা লাইন ছাড়িয়ে আরেকটায়, তারপর আরেকটায়, করতে করতে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। শিয়া বলল, 'আপনি উঠবেন না যেন। আমি আমার জিনিসগুলো নিয়ে আসি। তিনজনে একসঙ্গে নামব।'

২২ ঘণ্টা ২৮ মিনিটের পথ। এই দীর্ঘপথে লাল বাতির জন্য কোথাও দাঁড়াতে হয়নি। ট্রেন পৌঁছবার নির্দিষ্ট সময় ৯টা ২৫ মিনিট। ঘড়িতে ঠিক ৯টা ২৫ মিনিট হয়েছে।

শিয়া চলে এসেছে ওর সুটকেস নিয়ে। আমার সুটকেসটাও ও তুলে নিয়ে একটু এগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। লিও দাঁড়াল আমার পিছনে। আমার লাঞ্চব্যাগটা ও নিয়েছে। ওরা দুজনে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছে যাতে আমার নামতে একটুও কষ্ট না হয়, ধাক্কা না লাগে আমার গায়ে। ট্রেন থামল। যাত্রীরা নামতে শুরু করেছে। ওরা দুজন আমাকে এইভাবে আড়াল করেই নামিয়ে আনল, কারও গায়ের ছোঁয়া লাগল না একটুও।

৫

ট্রেনের জঠর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষে মানুষে স্টেশন উপচে পড়ছে। গেটের কাছে খুব ঠেলাঠেলি হচ্ছে। শিয়া আমার টিকিটটা চেয়ে নিল। টিকিট দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি লিও নেই। কোথায় গেল কী জানি। আমার ব্যাগটা আমার পায়ের কাছে রাখা আছে। অনেক কষ্টে গেটের বাইরে আসা গেল।

'আপনি এখন কোথায় যাবেন?' শিয়া জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'আমি কোথায় যাব আমি জানি না। তুমি স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেল ঠিক করে দাও।'

শিয়া বলল, 'আমি তো পেইচিং শহরে থাকি না, শহরের বাইরে থাকি। তাই এখানে কোথায় হোটেল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। কাজেই হোটেল খুঁজতে অনেক সময় লেগে যাবে। আমার বাড়ি পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি হোটেল খুঁজে নেব।'

শিয়া গেল না, কী একটু ভাবল, তারপর বলল, 'আপনি আমার বাড়িতে চলুন।'

এমন নিমন্ত্রণ পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে পেয়েছি এবং এতটুকু দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছি। আজ কেন যেন মনে একটু দ্বিধা এল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়িতে আর কে আছে?'

'আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতে থাকি।'

'কেন, গার্লফ্রেন্ডের বাড়িতে কেন? তোমার মা- বাবা?'

'আমার মা-বাবা অনেক দূরে থাকে। আমি এখানে চাকরি করি। বাড়ির কাছেই

অফিস। সেজন্য এখানে থাকি।' শিয়া বলল।

গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি শুনে আমি একটু দমে গেলাম। ইতস্তত করছিলাম।

'চলুন আমার বাড়ি। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না, যতদিন ইচ্ছে থাকবেন।'

বুঝতে পারছি শিয়া অধৈর্য হয়ে উঠছে। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে এই অজুহাতে ও আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে না। বারবার অনুরোধ করছে যাওয়ার জন্য। ওর কথা বিবেচনা করেই শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে শিয়া একটা অটো থামাল। অটো নিয়ে এল একটা বাসস্ট্যান্ডে। প্রায় আধঘণ্টা পর বাস যেখানে থামল, সেটা আরেকটা বাসস্ট্যান্ড। সব দূরপাল্লার বাস এখান থেকে ছাড়ে। ছোট বাস, পনেরো কুড়িজন যাত্রী যেতে পারে। অতিরিক্ত সিট থাকে ভাঁজ করা। যাত্রীর সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে ওগুলো খুলে দেওয়া হয়।

শহর ছাড়িয়ে বাস গ্রামের পথ ধরল। প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল। একটু উদ্বিগ্ন হলাম। কোথায় যাচ্ছি, কতদূর, সেখান থেকে দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখা সম্ভব হবে কিনা, কিছুই বুঝতে পারছি না। যখনই জিজ্ঞেস করছি, আর কতদূর শিয়া, শিয়া জবাব দেয়, এই এসে গেছি, আরেকটু। আরেকটু আরেকটু করতে করতে আরও আধঘণ্টা পর বাস একেবারেই থেমে গেল। সব যাত্রী নামল, আমরাও নামলাম।

শিয়া বলল, 'আপনি দাঁড়ান, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।'

আমার তো মাথায় হাত। পনেরো মিনিট অটো, তারপর আধঘণ্টা শহরের মধ্যে বাস, তারপর দেড় ঘণ্টা শহরের বাইরে বাস। এখন এই গ্রামে এসে আবার ট্যাক্সি! কোথায় এসে পড়লাম!

এখন তো আমি শিয়ার হাতের মুঠোর মধ্যে। ওর অন্য কোনও মতলব নেই তো! পরোপকারী সেজে আমায় ভুলিয়ে নিয়ে এল না তো? ইরাকের সন্ত্রাসবাদীদের খবর প্রায়ই কাগজে থাকে। ওরা বিদেশি পর্যটকদের হরণ করে, তারপর নিজেদের দাবি আদায় করে। দাবি আদায় না হলে মেরে ফেলে। শিয়াকে দেখে তো সন্ত্রাসবাদী বলে মনে হয় না। তাছাড়া চিনের সঙ্গে ভারতের সীমানা নিয়ে একটু মনকষাকষি চলছে বটে, কিন্তু ভারত তো চিনের শত্রুরাষ্ট্র নয়। এইসব উদ্ভট চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে জটলা করতে লাগল।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই শিয়া ট্যাক্সি নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শিয়া ট্যাক্সিতে কতক্ষণ লাগবে?'

শিয়া জবাব দিল,'বেশিক্ষণ নয়,পাঁচ মিনিট।'

মনে মনে বললাম, দেখা যাক কত পাঁচ মিনিট লাগে। যাই ঘটুক, এখন মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। রাগ দেখালে চলবে না।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই ট্যাক্সি একটা গলির মধ্যে ঢুকে দাঁড়াল। বাঁহাতে একটা বাড়ি। গাড়ি ঢুকতে পারে এমন চওড়া গেট। তবে ট্যাক্সি রাস্তার পাশেই দাঁড়াল। আমরা ট্যাক্সি থেকে নামলাম।

বাড়ির উঠোন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। শিয়া বলল, 'এই আমার গার্লফ্রেন্ড, ওর নাম পাও ছিন ইয়ান।'

প্রথম সম্ভাষণ কীভাবে করব, হাত তুলে নমস্কার জানাব কী করমর্দন করব বুঝতে

পারছিলাম না। বোঝাবুঝির আগেই পাও একটা সুটকেস তুলে নিয়ে উঠোনের দিকে হাঁটা দিয়েছে। পাওয়ের পিছন পিছন এসেছে এক বালিকা। মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এরা সহোদরা। সেও একটি সুটকেস তুলে নিয়ে চলে গেল।

রেলস্টেশন থেকে এই পর্যন্ত আসতে একবার অটোভাড়া আর দুবার বাসভাড়া শিয়া নিজে দিয়েছে, আমাকে দিতে দেয়নি। এবার শেষবারের মতো ট্যাক্সিভাড়া দিতে চেষ্টা করলাম। শিয়ার আগেই আমি আমার পকেটে হাত গলিয়ে দিয়েছি। শিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতে আমায় ঠেকিয়ে ডানহাতে নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারকে দিয়ে দিল।

বেশ বড় উঠোন, ইংরিজির ইউ আকৃতির। রাস্তার দিকটা খোলা, কোনও দরজা নেই। উঠোন দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে দুটো ঘর পাশাপাশি। দুই বোন হাতের বোঝা উঠোনের একপাশে নামিয়ে রেখে ওই ঘরেই ঢুকে গেল। ওই ঘর থেকেই বেরিয়ে এসে এক বয়স্কা মহিলা হাতে একটা চাবি নিয়ে এগিয়ে এলেন। উঠোনের বাঁহাতে একটা ছোট ঘর, অনুমান হয় এটা রান্নাঘর। ডানহাতে একটা ঘর, তালাচাবি দেওয়া। এটা শিয়ার ঘর। শিয়া সুটকেস রেখে চাবিটা হাতে নিয়ে ঘরের তালা খুলে মালপত্র ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আমায় ডাকল, 'আসুন।' ওর ঘরের সামনে জলের কল। সেখানে একটা ঝোড়াতে কিছু শাকপাতা রাখা আছে। কলমি শাকের মতো দেখতে। সম্ভবত ওটা ধোওয়ার কাজ চলছিল। অচেনা অতিথি এসে পড়ায় কাজটা অসমাপ্ত থেকে গেছে।

শিয়ার ঘরটা বেশ বড়। তার দুটো অংশ। বড় অংশে একজনের মতো শোওয়ার একটা খাট, বিছানা, একটা টিভি, একটা কম্পিউটার, কিছু জামাকাপড়। ঘরের ছোট অংশে রান্নার ব্যবস্থা। শিয়া জামাটা খুলে রেখেই গ্যাস জ্বেলে কড়াইতে ন্যুডলস চাপিয়ে দিয়েছে। আমি সেই সুযোগে দাঁত মাজা এবং ক্ষৌরকর্ম সেরে নিলাম। তারপর শিয়াকে বললাম, 'টয়লেট আর বাথরুমটা আমাকে দেখিয়ে দাও।' শিয়া বলল, 'সে তো দেরি আছে। আগে খেয়ে নিন, তারপর সন্ধেবেলায় স্নানের জায়গায় নিয়ে যাব।'

আমি মনে মনে বলি, শিয়া বলে কী, আগে খাওয়া তারপর স্নান-বাথরুম! মুখে বললাম, 'টয়লেট না সেরে, স্নান না করে আমি তো কিছু খেতে পারব না।'

শিয়া বলল, 'আমরা তো তাই করি, সবার শেষে বিকেলে স্নান।'

আমি বললাম, 'স্নান না হয় না-ই হল, কিন্তু টয়লেট যে যেতেই হবে।'

'চলুন।'

আমি শিয়ার পিছন পিছন চললাম। ২২ ঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে এদের আচার-আচরণ কিছুটা বুঝে নিয়েছি। এরা খেয়ে আঁচায় না, পায়খানা করে জলশৌচ করে না। সুযোগমতো আমার ব্যাগ থেকে একটা ছোট জলের বোতলে এক বোতল জল নিয়ে নিয়েছি। সেটাকে আড়াল করে নিলাম যাতে শিয়া দেখতে না পায়।

উঠোন পার হয়ে গেটের কাছে ডানহাতে একটা ছোট প্রকোষ্ঠ দেখিয়ে শিয়া বলল,'টয়লেট। ডানদিকে মেয়েদের, বাঁদিকে ছেলেদের।'

আমাদের ছোট ছোট রেলস্টেশনে যেমন থাকে, শৌচালয়ের সামনে মাথা সমান

উঁচু আর চার-পাঁচ ফুট চওড়া ইটের গাঁথুনি, তার বাঁপাশ দিয়ে গেলে ছেলেদের আর ডানপাশ দিয়ে গেলে মেয়েদের, ঠিক সেইরকম ব্যাপার। বাঁপাশ দিয়ে ঢুকে দেখলাম এখান থেকেও ডানপাশে চলে যাওয়া যায়। সে না হয় গেল। এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। একই পরিবারের সবাই ব্যবহার করে তো। বিপজ্জনক ব্যাপার হল, ডাইনে-বাঁয়ে কোনওটাতেই দরজা নেই, পর্দাও নেই, একেবারে খোলা, কোনওরকম আব্রু নেই। অর্থাৎ ভেতরে কেউ থাকলে, আর কেউ যদি না জেনে ঢুকে পড়ে, কেউ কারোর আড়ালে যেতে পারবে না, দুজনেই বেইজ্জত।

সে যাই হোক, ভেতরে তো ঢুকলাম। কমোড তো নেই-ই, বসার জন্য পাদানিও নেই। শুধু একটা গর্ত। ঠিক যেমনটি দেখেছি ট্রেনে। গর্তের মধ্যে পুরীষ আর টিসু পেপার জমা হচ্ছে, কত বছর ধরে তা কে জানে। নৈকষ্য পুরীষের গন্ধে ভুর ভুর করছে। তবুও অনন্যোপায় হয়ে গর্তের দুপাশে পা দিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু বসতে পারলাম না। বাধ সাধল বাঁ হাঁটু। সে বাত রোগে আক্রান্ত। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত পুরীষের নির্ভেজাল উগ্র গন্ধ ভোগ করছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়, দুই হাঁটুর ওপর দুই হাতের চেটো রেখে যতটা সম্ভব হাঁটু ভেঙে, অর্থাৎ আধা বসা আধা দাঁড়ানো অবস্থায়। মনে পড়ে, শৈশবের পাঠশালার কথা। দুষ্টুমি করলেই পণ্ডিতমশাইরা ছেলেদের ওইভাবে দুহাতে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। এখানে অবশ্য কান ধরতে হয়নি। অনেক সংযমের পরীক্ষা দিয়ে মিনিট দুই ওইভাবে আধা বসা অবস্থায় রইলাম। এই পরিবেশে শরীরের অভ্যন্তরের কলকব্জা অনড় হয়ে রইল। প্রাণ-বিদীর্ণ আকুতিতেও তাদের কোনও সাড়া পেলাম না।

জল ভরা শিশিটা হাতে নিয়ে ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

শিয়া ততক্ষণে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমি খেতে বসলাম। খিদে আছে খুব কিন্তু খাওয়ার সুখ নেই। তবু কিছু খেতে হল।

খাওয়া শেষ হতে শিয়াকে বললাম, 'তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এখন আরেকটু উপকার করতে হবে।'

আজ সকাল থেকেই শিয়ার সঙ্গে আছি। অনেক কথাবার্তা হয়েছে ওর সঙ্গে। কিন্তু যেমন করে তার বর্ণনা দিয়ে গেলাম, তেমন সহজভাবে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়নি, হওয়া সম্ভব ছিল না। শিয়ার ইংরিজি ভাষায় দখল যেমন খুবই সীমিত, চিনা ভাষায় আমার অবস্থাও ঠিক সেইরকম, সেকথা আগেই বলেছি। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান খুব ধীরগতিতে চলছিল এবং সেটা উভয়ের পক্ষেই খুব শ্রমসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

শিয়া বলল,'আমি তো ইংরিজি ভালো জানি না, কম্পিউটারটা খুলি, তাতে দুজনে কথা বলতে সুবিধে হবে।'

শিয়ার কথার মানে বুঝতে পারলাম না। বোকার মতো চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

শিয়া কম্পিউটার খুলল। আমাকে একটা টুল দিল ওর পাশে বসবার জন্য। কম্পিউটার খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রথম বিস্ময়, মনিটরের ডেস্ক টপে যে আইকনগুলো থাকে সেগুলো সব চিনা ভাষায় লেখা। এও কি সম্ভব!

এবার শিয়া একটা সফটওয়্যার খুলল। তার টুলবারে যেসব নির্দেশাবলি লেখা

আছে তা সবই চিনা ভাষায়।

শিয়া বলল, 'আপনি যা বলছেন, তা ইংরিজিতে টাইপ করুন।'

আমি লিখলাম— শিয়া তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। তার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তোমার এখানে থাকলে আমার খুব ভালো হত। কিন্তু তোমার বাড়ি পেইচিং শহর থেকে অনেক দূরে। এখান থেকে রোজ একা একা কোথাও যাওয়া, আবার ফিরে আসা বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তুমি তো আমার সঙ্গে রোজ বেরতে পারবে না, তোমারওতো কাজ আছে। তা ছাড়া তোমাদের টয়লেট আমি ব্যবহার করতে পারছি না, আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাই তুমি পেইচিং শহরের মধ্যে একটা হোটেল ঠিক করে আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

আমার লেখা শেষ হতে শিয়া একটা বোতামে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখাটা চিনা ভাষায় অনূদিত হয়ে চিনা লিপিতে লেখা হয়ে গেল। কম্পিউটারের সাহায্যে এরকম অনুবাদের ব্যবস্থা আমাদের দেশে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

শিয়া লেখাটা পড়ে চিনা লিপিতে কিছু টাইপ করল। তারপর একটা বোতামে চাপ দিতেই সেই লেখা ইংরিজিতে লেখা হয়ে গেল। শিয়া লিখেছে, আপনাকে আমি কষ্ট দিয়েছি, সেজন্য আমি খুব দুঃখিত। আমি ইন্টারনেট খুলে হোটেল বুক করবার চেষ্টা করছি।

শিয়া ইন্টারনেট খুলল। সবকিছুই চিনা ভাষায়, আমি একটুও বুঝতে পারছি না। অনেকক্ষণ পরে শিয়া বলল, 'কম দামের কোনও হোটেল পাচ্ছি না। সবই বেশি দাম। একটা হোটেল পেয়েছি, ৩৬৫ উয়ান। বুক করব?

৩৬৫ উয়ান মানে প্রায় ৪৬ ইউ এস ডলার। আমার কাছে খুব বেশি। কিন্তু উপায় কী! এখান থেকে যেতেই হবে, তারপর দেখা যাবে।

আমি বললাম, 'করো। এখন তো যাই। পরে সস্তার হোটেল খুঁজে নেওয়া যাবে।'

শিয়া বলল, 'ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চলুন, টেলিফোন বুথে যাই।'

কাছেই টেলিফোন বুথ। শিয়া কথা বলে বলল, 'ইন্টারনেটে বুক করার জন্য অনেক ডিসকাউন্ট দেবে। ২১৮ উয়ানে হয়ে যাবে।'

২১৮ উয়ান মানে ২৫ কি ২৬ ইউ এস ডলার হবে। মোটা-মুটি ভালো। সব দেশেই আমার হোটেলভাড়ার বাজেট থাকে ১০ ডলার থেকে ২০ ডলারের মধ্যে। বাজেটের মধ্যে যদি কোনও হোটেল খুঁজে নিতে পারি তো খুব ভালো, আর যদি না পারি তো এই দামি হোটেলেই একটু বিলাসিতা করে কাটাব পেইচিংয়ে।

টেলিফোন বুথের বিলটাও শিয়া আমাকে দিতে দিল না।

'চলুন, তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

আমরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। পাওয়ের মা চলে যাচ্ছি দেখে অনুরোধ করলেন কদিন থেকে যাওয়ার জন্য। আমি অসুবিধার কথা জানিয়ে হাতজোড় করে বিদায় জানালাম।

ট্যাক্সিতে উঠেই আমি বললাম, 'শিয়া, টেলিফোনের পয়সাও আমাকে দিতে দিলে না। এবার কিন্তু সব ভাড়া আমি দেব।'

শিয়া মুচকি হেসে বলল, 'আমার পকেট ফাঁকা হোক না, তখন তো আপনাকেই

সব দিতে হবে।’

মনে মনে বললাম, শিয়া, তোমার ঋণ কী করে শোধ দেব।

৬

জায়গার নাম লিউলিচিয়াও নান। হোটেল ইনতু পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে হল। শিয়া শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামে থাকে, এ শহরের সবকিছু ভালো করে চেনে না। তাই খুঁজে পেতে একটু বেশি সময় লাগল। অভ্যর্থনা টেবিলে গিয়ে শিয়া টেলিফোনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই তরুণী বলল, ‘হ্যাঁ, মনে আছে। পাসপোর্ট দিন আর ২১৮ উয়ান দিন।

লেখালেখির কাজ শেষ করে পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বলল, ‘একুশ তলায় তিন নম্বর ঘর’।

আর্দালি মালপত্র নিয়ে আগেই চলে গেছে। এলিভেটরে উঠে ২০ নম্বর বোতামে চাপ দিলাম। শিয়া আবার ২১ নম্বর টিপল।

‘কেন ২১ নম্বর টিপলে?’

নম্বরের বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি বোতামের নম্বর ১ থেকে শুরু হয়েছে, ‘জি’ নম্বরের কোনও বোতাম নেই। তার মানে বাড়ির তলগণনা বাংলা নিয়মে চলে, ইংরিজি নিয়মে নয়।

২১ নম্বরে নেমে ৩ নম্বর ঘরের দরজা খুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুক হালকা করলাম। সুটকেসটা নামিয়ে রেখে শিয়া বলল, ‘আমি এখন যাই, কাল সকাল দশটার মধ্যে আসব।’

‘আসবে তো ঠিক?’

‘নিশ্চয়ই আসব,’ বলে শিয়া চলে গেল।

কুয়াং ছুয়োর তেল কোম্পানির হোটেলের ভাড়া ছিল ১০০ উয়ান। এ ঘরের ভাড়া ২১৮ উয়ান। এখানে আরামের ব্যবস্থা একটু বেশি থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। সেই হোটেলে যা যা অভাব ছিল এখানে সে অভাব পূরণ হল। কিছু অতিরিক্ত জিনিস আছে যা সে হোটেলে ছিল না। টেবিলের ওপর একটা ফাইল রাখা আছে, তার মধ্যে আছে চিঠি লেখার কাগজ, কলম আর হোটেলের নাম লেখা খাম। কিঞ্চিৎ উগ্র বিলাসিতার ব্যবস্থা— একটি মিনি বার আছে। তার মধ্যে নানান রঙের পানীয়ের বোতল সাজানো আছে, আছে বাদাম ভাজা আর চকলেট। কিন্তু আমি ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস। জুতো পালিশের রং, ব্রাশ আছে। সাদা চপ্পল দুজোড়া যেন আরও নরম, আরও মোলায়েম। স্নানঘরে সবকিছু দুপ্রস্থে সাজানো আছে। বাথটাবটি বড় সুন্দর। জলের গামলাটা বেশ বড়, তার মধ্যে জামাকাপড় কাচাও চলতে পারে।

তাজা দেহ খুশি মন নিয়ে বেরিয়ে এলাম স্নানঘর থেকে।

রাত আটটা হয়েছে। আজ আর কোথাও বের হব না। কাল শিয়া এলে বেড়ানোর পরিকল্পনা করা যাবে।

উত্তরের দেওয়াল জুড়ে কাচের জানলা। জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার

টেনে নিয়ে বসলাম। একুশ তলার ওপর থেকে দেখছি রাতের পেইচিং। লাল নীল সবুজ হলুদ আলোয় বিভাসিত চারদিক। অনেক চওড়া রাস্তা। চাবি দেওয়া খেলনার মতো পাশাপাশি লাইন দিয়ে গাড়ি চলেছে। যেন লাল টুনি বাতির মিছিল। কতগুলো লাইনে যাচ্ছে আসছে গোনা যাচ্ছে না। একটা উড়ালপুল ডাইনে-বাঁয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। পুতুলের মতো মানুষ চলেছে পথ দিয়ে।

চায়ের স্বাদ কোনওদিন জানা হয়নি। সত্তর ছুঁই ছুঁই বয়সে এইবার প্রথম জানলাম চা কী জিনিস, মাত্র দুদিন আগে কুয়াং ছুয়োতে তেল কোম্পানির হোটেলে। চিনারাই নাকি আসল চা-সেবী। সময় নেই অসময় নেই, চা পেলেই হল। ভাত খেতে বসে আগে চা পান করে। তাও কাপে হয় না, মগ নিয়ে বসে। তারপর খাওয়া শুরু হয়। চা শব্দটাও কিন্তু খাঁটি চিনা শব্দ। চা লেখাটা সুন্দর। চিনা লিপি মানে ছবি, পিক্টোগ্রাফ, যাকে বলে ক্যারেক্টার। একেকটা ছবি ভেঙে ভেঙে একেকটা ক্যারেক্টার তৈরি হয়েছে। চা হল একটা ডাঁটির দুপাশে দুটো পাতা। চিনের লাল চা আর সবুজ চায়ের গল্প শুনে আসছি সেই ছোটবেলা থেকে। এতকালের দমিয়ে রাখা কৌতূহল মেটানোর জন্যই সেই একদিন চা সেবন করেছিলাম নিজে বানিয়ে। আজও ফ্লাস্ক থেকে গরম জল ঢাললাম কেটলিতে। একটা সবুজ প্যাকেট ছিঁড়ে কেটলির মধ্যে ফেলে দিলাম। সেদিন দিয়েছিলাম লাল প্যাকেট।

এই হল চিনের চা। গরম জলে চায়ের গুঁড়ো ফেলে দিলেই চা হয়ে গেল। চায়ের সঙ্গে লাঞ্চব্যাগ থেকে নিয়ে বিস্কুট, ডালমুট আর কুয়াং ছুয়ো থেকে কেনা রুটি দিয়ে জলযোগ সেরে নরম গদির ওপর দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

শুয়ে শুয়ে চিন ভ্রমণের প্রথম চারদিনের ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ করছি। মনের পর্দায় দুটো মুখ ভেসে উঠছে— লি কুয়াং আর ছাও উয়ানউয়ান। একেবারে অযাচিতভাবে স্বেচ্ছায় পথে দেখা একজন অপরিচিত বিদেশিকে এভাবে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে এই অপরিণত বয়সে, ভাবতেই কেমন বিস্ময় লাগে। প্রায় দু দশক ধরে বিদেশ চুঁড়ে বেড়াচ্ছি। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শহরে বহু মানুষ এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছায় সাহায্যের জন্য। তার মধ্যে জর্ডনের আম্মানে হোটেলের মালিক ফায়েজ আলকালি, বিদেশ ভুঁইয়ে হঠাৎ পাওয়া এমন উদার-হৃদয় বন্ধুর কথা ভুলতে পারি না। কিন্তু চিন দেশের এই দুই কলেজ পড়ুয়া পরার্থপরতার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে রইল আমার কাছে। যেন নিজের কলেজের দুই ছাত্রছাত্রীকে পেয়েছিলাম সেদিন।

এদের পাশেই ভেসে ওঠে আরেকটি মুখ, শিয়া শাও ছুন। একরকম জোর করেই আমাকে নিয়ে গেছে ওর বাড়িতে। মনে মনে একটু অনিচ্ছা ছিল ওর বাড়ি যেতে। দ্বিধা ছিল, আশঙ্কা ছিল মনে। সংকীর্ণ মন নিয়ে বিচার করেছি। কত অবাস্তব অসঙ্গত কল্পনা করেছি ওর সম্পর্কে, ওর বাড়ি সম্পর্কে। ওর মহত্ত্বকে, ওর উদারতাকে ছোট করে দেখেছি। শরমে আপনার কাছে আপনি ছোট হই। মনে মনে বলি— শিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো।

চোখদুটো বুজে আসছে, শাসন মানতে চাইছে না। চোখের দোষ কী। কাল সারারাত ট্রেনে জেগেই বসেছিলাম।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রত্যুষে চিড়ে, চালভাজা আর ডালমুট দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নীচে নেমে এলাম। এলিভেটর থেকে নেমে বাঁহাতে অভ্যর্থনা টেবিল, তার সামনে সময় কাটাবার জন্য বসার জায়গা। এর পাশে রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টকে পিছনে রেখে একটু এগিয়ে গেলে হোটেলের প্রবেশদ্বার। কাচ লাগানো দরজা ঠেলে বাইরে এলে গাড়ি দাঁড়াবার জায়গা। তারপর ছোট একটা রাস্তা। রাস্তায় নেমে ডাইনে ঘুরলেই বড় রাস্তা।

ছয় গলির রাস্তা দিয়ে অবিরাম গাড়ি ছুটে চলেছে। সেই কুয়াং ছুয়ো থেকে দেখে আসছি, সবই ছ গলি, আট গলির রাজপথ, তার কমে এখনও পর্যন্ত একটাও বাস চলাচলের রাস্তা পাইনি। পথ পারাপারের ব্যবস্থাও সর্বত্র একইরকম। পথের মাঝখানে উঁচু রেলিং দেওয়া। ইচ্ছেমতো যেখান থেকে খুশি পারাপার কোনওরকমেই সম্ভব নয়। তার জন্য আছে মাথার ওপরে পুল আর মাটির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গপথ। এত সুন্দর সুন্দর বড় বড় রাস্তা এল কোথা থেকে!

কুয়োমিনটাং ক্ষমতায় আসার পর থেকে চিয়াং কাই শেক সহ চারটি মাত্র পরিবার দেশটাকে লুটেপুটে খেয়েছে। চিয়াং কাই শেক, সুং, কুং, চেন কুও-ফু আর তার ভাই চেন লি-ফু— এই চিনের চার বড় পরিবার। তুলো, চাল আরও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কারবার এরা কুক্ষিগত করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজশে ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আরও কিছু শিল্পে এদের একচেটিয়া আধিপত্য। গ্রামে বেশিরভাগ জমির মালিক এই চার পরিবার। গরিব চাষিদের বিনা মজুরিতে খাটিয়ে নেয় অথবা যা পয়সা দেয় তার থেকে বেশি শুল্ক আদায় করে। চড়া হারের সুদে টাকা ধার দেয় চাষিদের। সুদের দায়ে ঘর বাড়ি জমি বেচতে হয়। একেবারে আমাদের দেশের জোতদারি মহাজনি ব্যবস্থা।

দেশের চারটি সরকারি ব্যাঙ্ক— ব্যাঙ্ক অব চায়না, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব চায়না, ব্যাঙ্ক অব কমিউনিকেশনস এবং ফারমার্স ব্যাঙ্ক অব চায়না। এই চারটি ব্যাঙ্ক কুয়োমিনটাংয়ের কোষাগার নিয়ন্ত্রণ করে, বাজারে বন্ড ছাড়ার আর নোট ছাপানোর অধিকার ভোগ করে। এই চার ব্যাঙ্কে কাজকর্ম চলে ওই চার পরিবারের আঙুলের ইশারায়। বাজার থেকে সমস্ত রুপো তুলে নিয়ে শুধু নোট ছাপিয়ে টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলা হল কুয়োমিনটাংয়ের নির্দেশে। আর কুয়োমিনটাংয়ের নির্দেশ মানেই ওই চার পরিবারের নির্দেশ। ১০,৩১৮,০০০ মিলিয়ন উয়ান নোট ছাপা হল। তার মানে ওই সংখ্যার পর আরও ছটা শূন্য বসিয়ে এবার সংখ্যাটা পড়ুন। নোটের ওপর মানুষের আর আস্থা রইল না। জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল ভয়ঙ্কররকম। সে মুদ্রাস্ফীতি কল্পনায় আসে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে আমাদের ছেলেবেলার ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের বড়দা চিন ঘুরে এসেছেন ১৯৪৯ সালে, চিন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে। চিনা ভাষায় বড়দার পাণ্ডিত্য ছিল। চিন থেকে ফিরে সেদেশের নানান গল্প বলতেন মাস্টারমশাইদের কাছে। আমরা ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেলে পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। সেইরকম একটা গল্প বড়দার নিজের কথায় শুনুন:

কুয়োমিনটাংয়ের গদি টলমল করছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে

পিকিংয়ের দিকে। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিপর্যয় ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় এক টিন কেরোসিন কিনব বলে দোকানে গেছি। 'কত দাম?'— জিজ্ঞেস করলাম। দোকানদার দাম বলল। বেশি চাইছে না তো? যাচাই করব বলে আরেকটা দোকানে গেছি। সেই দোকানদার আরও বেশি দাম চাইল। ফিরে এলাম আগের দোকানে। 'দিন তো এক টিন।'

এবার দোকানদার নতুন দাম হাঁকল, তা পরের দোকানের থেকেও বেশি।

'এই যে দশ মিনিট আগে অন্যরকম দাম চাইলেন?'

দোকানদার অন্যজনকে মাল দিতে দিতে বলল, 'নিতে হয় এক্ষুনি নিন, দেরি করলে আর দশ মিনিট পরে আবার অন্যরকম শুনবেন।'

বুঝুন। ঘোড়দৌড়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। বছর নয়, মাস নয়, দিন নয়, ঘণ্টা নয়, মিনিটে মিনিটে জিনিসের দাম বাড়ছে। দেশের এইরকম আর্থিক অবস্থায় চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে। কীভাবে সেই অবাধ্য ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে সে গল্পও শুনেছি। তখন তো মুদ্রাস্ফীতি কথার মানে বুঝতাম না, তাই সে গল্পটা আর ভালো করে মনে নেই।

যেকথা হচ্ছিল, চিয়াং কাই শেক দেশের অর্থভাণ্ডারকে গজভুক্ত কপিত্থের মতো করে ফেলে রেখে তাইওয়ানে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। একহাতে মুদ্রাস্ফীতির মুখ পশ্চাৎমুখী করা অন্য হাতে নতুন অর্থনীতি গড়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দু হাতে সব্যসাচীর মতো হাল ধরে ছিলেন মাও সে তুং। তবেই না রেলিং দিয়ে ঘেরা ছ গলি আট গলিওয়ালা রাজপথ, লম্বা লম্বা উড়ালপুল, রাস্তা পারাপারের জন্য সেতু, সুড়ঙ্গপথ, অত্যুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, আকাশ ফুঁড়ে ওঠা বড় বড় বাড়ি।

মাথায় ছাউনি দেওয়া লম্বা বাসস্টপ। কতগুলো থামের গায়ে বাসের নম্বর লেখা। দিনের প্রথম বাস আর রাতের শেষ বাস কখন যাবে, কোন পথ দিয়ে কোন বাস যাবে, সব লেখা আছে নম্বরের তলায়। এই জায়গাটার নাম লিউলিচিয়াও নান। বলার সময় সবাই 'নান' শব্দটা বাদ দিয়ে বলে। কিছু ভিখিরি ঘোরাঘুরি করছে।

ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলেছি। পথচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার দিকে, মুখে মিষ্টি হাসি।

হাসি বিনিময় করে বলি, 'উও ইন্তুরেন' (আমি ভারতীয়)।

'ইন্তুরেন!' একসঙ্গে অনেক কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। অনাবিল হাসি। কাছে এগিয়ে আসে। যেন কিছু বলতে চায়, বলতে পারে না। আমার ধুতি-পাঞ্জাবি ওদের কাছে বিস্ময়। কোনওদিন দেখেনি এ পোশাক। ফুটপাতের ওপর সাইকেল রিকশার লাইন। মাথায় ছাউনি দেওয়া ঠিক আমাদের মতো। মুচকি হেসে হাতের ইশারায় ডাকে, যাবে নাকি। আমি হাত নেড়ে বলি, না।

বেশি দূর এগোই না। নটা বাজে। শিয়া বলেছে নটা থেকে দশটার মধ্যে আসবে। হোটেলে ফিরে এসে বিরামের জায়গায় বসি।

অভ্যর্থনা টেবিলে তিনটি করে মেয়ে বসে। তার মধ্যে যেটি চেহারায় সবথেকে ছোট, মনে হবে স্কুলের গণ্ডি এখনও পার হয়নি, হাসিমাখা ফুটফুটে মুখখানা, হাত, পা, চোখ, মুখ প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনে দুরন্তপনার ছাপ, তার নাম ছাং থিংথিং। একটু

স্থির হয়ে চেয়ারে বসে থাকা বুঝি ওর ধাতে নেই। কাজ চালাবার মতো ইংরিজি বলতে পারে। ওকে বললাম, 'মঙ্গোলিয়ায় যাওয়ার টিকিট কোথায় পাওয়া যাবে?'

ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, 'মঙ্গোলিয়া? জানি না তো। পাশের কাউন্টারে জিজ্ঞেস করুন তো।'

অভ্যর্থনা টেবিলের উত্তরপাশে আরেকটা ছোট টেবিলের ওপর তেকোনা পিতলের পাতে লেখা আছে 'টিকেটিং'। ইংরিজিতে লেখা আছে। এই প্রথম একটা ইংরিজি লেখা দেখলাম। সেখানে একটি মেয়ে বসে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি মঙ্গোলিয়া যাওয়ার টিকিট করো?'

'মঙ্গোলিয়া? কোথায় সেটা?' তার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়।

আমি ততোধিক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি, 'সে কী! মঙ্গোলিয়া জানো না?'

'না তো।'

সে আগের তিন সহকর্মীকে ডাকল। 'ছাং, মঙ্গোলিয়া কোথায়?'

চারজনে এক জায়গায় হল। তারপর মৌখিক গবেষণায় বসল। তাই তো, মঙ্গোলিয়া কোথায় হতে পারে।

আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা বলুন তো, মঙ্গোলিয়া কি পেইচিংয়ের মধ্যে? না পেইচিংয়ের বাইরে?'

আমি মনের বিরক্তি গোপন রাখার চেষ্টা করে বলি, 'কী জ্বালা, তোমরা কি ইস্কুলে ভূগোল পড়োনি? নিজের দেশের ম্যাপটাও কোনওদিন দেখোনি? চিনের উত্তর সীমায় গায়ে লাগানো যে দেশটা তার নাম মঙ্গোলিয়া।'

ওরা চারজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

'আমরা তো জানি না।' চারজনেরই মলিন মুখ।

আমি হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। এ তো দুরূহ সমস্যা। মঙ্গোলিয়ার নামই যদি কেউ না শুনে থাকে তাহলে সেখানে যাওয়ার টিকিট কাটব কী করে?

আবার আমি জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, তোমরা উলান বাতোর-এর নাম শুনেছ তো?'

'উলান বাতোয়া? সে আবার কোথায়?' চার-জোড়া বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ আমাকে বিদ্ধ করতে লাগল।

চিনারা কোনও শব্দের শেষের 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। শব্দের শেষে 'র', উলান বাতোর হয়েছে উলান বাতোয়া।

ওরা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি লাসার কাছে হবে?'

'তোমার মুণ্ডু।' বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় ধমক লাগালাম যাতে বুঝতে না পারে। মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাতোয়া তাও জানো না?'

অবস্থা বেগতিক বুঝে ছাং থিংথিং আর ওর দুই বান্ধবী গুটিগুটি সরে পড়ল। আমি চারদিকে দেখছি, যদি চিন ছাড়া অন্য কোনও বিদেশি পর্যটককে দেখতে পাই।

এমন সময় দেখি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এলিভেটর থেকে নেমে এইদিকে আসছে। ছাং থিংথিং দৌড়ে এসে ওর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চোখ নাচিয়ে বলল, 'ওদের জিজ্ঞেস করুন তো, ওরা বলতে পারবে।'

ওদের কাছে আসতে বললাম, 'তোমরা বলতে পারবে, মঙ্গোলিয়া যাওয়ার জন্য টিকিট কোথা থেকে কাটা যায়?'

ছেলেটি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'মঙ্গোলিয়া?' যেন আকাশ থেকে এইমাত্র মর্তে নেমে এসেছে।

'তোমরা এত পড়াশুনা করেছ, আর মঙ্গোলিয়া দেশের নাম শোনোনি?'

নিতান্ত অপরাধীর মতো ছেলেটি বলল, 'দুঃখিত।'

রাগে আমার মাথাটা ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। এরা যদি আমার কলেজের ছাত্রছাত্রী হত তাহলে রাগ চেপে রাখতে পারতাম না। ঠাস ঠাস করে সবকটার গালে চড় কষিয়ে দিতাম।

আবার মনে মনে ভাবছি, আমার বলায় ভুল হচ্ছে না তো। সঙ্গে আছে চাইনিজ প্র্যাক্টিক্যাল রিডার আর ক্লাসের খাতা। চিনের ভূখণ্ডে ঢোকার পর থেকেই এই দুটো সবসময়ই সঙ্গে রাখছি। যখনই কোনও শব্দ মনে করতে পারি না, চট করে খাতা বা বইয়ের পাতা উল্টে দেখে নিই। দেশের নামের পাতাটা উল্টে দেখে নিলাম চট করে। ইউরোপ এশিয়ার প্রায় দশ-পনেরোটা দেশের নাম চিনা লিপিতে লেখা আছে। শুধু মঙ্গোলিয়াই লেখা নেই।

ব্যাগ থেকে কাগজ আর কলম বের করে পূর্ব এশিয়ার পুরো মানচিত্র আঁকলাম। তার মধ্যে চিনের সীমানা দেখালাম। তার ওপর লিখলাম 'চোংকুয়ো' (চিন)।

এবার ওদের সবাইকে উদ্দেশ করে বললাম, 'এই হল তোমাদের দেশ চোংকুয়ো, চিনতে পারছ তো?'

সকলেই একসঙ্গে জবাব দিল, 'হুঁ।' সবাই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

'এই তোমাদের দেশের উত্তর সীমায় এই হল মঙ্গোলিয়া। বুঝতে পারছ?'

ছেলেটি টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও....! মংকুয়ো।' ভাবটা এমন করল যেন— এ আর এমন কী। এ তো জানি-ই আমরা।

টিকেটিং কাউন্টারে যে মেয়েটি বসে, উৎফুল্লবদনে দন্ত বিকশিত করে সুর করে টেনে টেনে একদমে অনেকক্ষণ ধরে বলল, 'মংকুয়ো...ও....ও....ও....।'

ছাং থিংথিং নাচতে নাচতে এল, 'মংকুয়ো....।'

ছাংয়ের দুই বান্ধবী ওখান থেকেই চেঁচাল, 'মংকুয়ো... মংকুয়ো...।'

মংকুয়ো মংকুয়ো করে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। যেন অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া অমূল্য রতন হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে। কাছাকাছি যারা ছিল সবাই হাঁ করে দেখছে এদিকে। পাশের রেস্টুরেন্টে যারা খাচ্ছিল তাদের খাওয়া থেমে গেছে, কাচের ভেতর থেকে এইদিকে দৃষ্টি সবার। অনুধাবন করবার চেষ্টা করছে কী ঘটেছে ওখানে। একটি মেয়ে তো খাওয়া ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে জানতে, ঘটনাটা কী।

এতক্ষণে আমার চেতনা হল, আসলে দোষ তো আমারই। খাতায় না-ই বা লেখা রইল। চিনা ভাষায় 'কুয়ো' কথার মানে হল 'দেশ', এ তো বিলক্ষণ জানি। চিন হচ্ছে চোংকুয়ো, ইংল্যান্ড হল ইংকুয়ো, ফরাসি ফাকুয়ো এইরকম। মঙ্গোলিয়ার লিয়া বাদ দিয়ে ওখানটায় যদি কুয়ো বসিয়ে দিতাম তাহলে বোধহয় সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হতে পারত। ওদের খামোকা এতক্ষণ গালমন্দ করেছি। ঘণ্টাখানেক সময়

নষ্ট হয়েছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বলতে পারবে, মংকুয়োর ট্রেনের টিকিট কোথা থেকে কাটতে হবে?'

ছেলেটি বলল, 'স্টেশনে চলে যান।'

এমন সময় শিয়া এল। সঙ্গে পাও ইয়ান।

'নি হাও।'

'নি হাও। হোটেলটা কেমন, ভালো তো?'

'খুব ভালো।'

'চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

৭

'এখন আমরা কোথায় যাব শিয়া?'

'তিয়ান-আনমেন স্কোয়্যার।'

তিয়ান-আনমেন স্কোয়্যার যাচ্ছি। কত শুনেছি এই নাম, কাগজে পড়েছি, বইতে পড়েছি। আনন্দে নেচে উঠল মন।

পথে চলতে চলতে বললাম, 'শিয়া, আজ কিন্তু সব খরচ আমার। না হলে আমি কিন্তু খুব রাগ করব।'

শিয়া মুচকি হাসল। বাসে উঠেই কন্ডাক্টারের হাতে একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়্যার তিনটে।' আমি পকেট থেকে পয়সা বের করবার সুযোগই পেলাম না।

তিয়ান-আনমেন। ১৪১৭ সালে মিং রাজাদের প্রতিষ্ঠিত, পেইচিং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চিনের সবথেকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান তিয়ান-আনমেন।

আফিং যুদ্ধের পর থেকে চিং রাজবংশের পতন শুরু হল। পরপর গোটাকয়েক যুদ্ধ আর প্রজাবিদ্রোহে মাঞ্চু রাজার সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৪ সালের তাইপিং বিদ্রোহ চিং রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। গোটা সাম্রাজ্যে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এই বিদ্রোহ থেকে। প্রশাসনিক আমলার পদে চাকরির পরীক্ষায় ব্যর্থ হুং শিউ চুয়ানের নেতৃত্বে হয়েছিল এই বিদ্রোহ। সে নিজেকে বলত ঈশ্বরের পুত্র, যিশুর ছোট ভাই।

শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে— এই তার সংকল্প। সহজ সরল তার বক্তব্য। সব মানুষ সমান, দেশের সম্পদে সবার অধিকার সমান। এই বক্তব্যে আকৃষ্ট হল দেশের দরিদ্র কৃষক, শ্রমিকরা। তারা সমবেত হল হুঙের নেতৃত্বে, বিদ্রোহ ঘোষণা করল বিদেশি শাসক মাঞ্চু রাজার বিরুদ্ধে। হুং ১ জানুয়ারি, ১৮৫১ সালে ঘোষণা করল স্বাধীন সাম্রাজ্য তাইপিং তিয়েন-কুয়ো, যার অর্থ হল স্বর্গীয় পরম শান্তির রাজ্য (হেভেনলি কিংডম অব গ্রেট পিস) প্রতিষ্ঠার কথা। সে নিজে হল সেই সাম্রাজ্যের স্বর্গীয় রাজা, তিয়েন ওয়াং। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা মাঞ্চু রাজার এই পরাজয়কে সুযোগ হিসেবে নিল, মাঞ্চু রাজাকে মদত দিল তাইপিং রাজার বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি

জটিল হল। হুং পরাজয় স্বীকার না করে আত্মহত্যা করল।

কিন্তু হুং শিউ চুয়ান কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র মানুষের মধ্যে সমানাধিকারের যে বাণী ছড়িয়ে গেছে আর বিদেশি মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সাহস দিয়ে গেছে তা তার মৃত্যুতেই শেষ হয়ে গেল না, বরং তার আরও উন্মেষ ঘটেছিল। ভেবে দেখুন তো, মাও সে তুংয়ের সাম্যবাদের চিন্তাধারার উৎসও হুং শিউ চুয়ান হতে পারে কিনা?

১৯০০ সালে আবার নতুন এক বিদ্রোহী দলের অভ্যুদয়ে গণ-অভ্যুত্থান হল। একে বলে মুষ্টিযোদ্ধাদের বিদ্রোহ, বক্সার রেবেলিয়ন। ১৯১১ সালে ১০ অক্টোবর ডঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে বিপ্লব হল। এই হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চিং রাজবংশের উৎখাত সম্পূর্ণ হল, সেই সঙ্গে চিনে ২০০০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হল।

মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে চিন কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক দীর্ঘ পদযাত্রা হল দক্ষিণ চিন থেকে উত্তর চিন পর্যন্ত। সময় লেগেছিল এক বছর— অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে অক্টোবর ১৯৩৫। চিনের জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হল। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাংয়ের শাসনের অবসান হল।

১ অক্টোবর, ১৯৪৯ সাল বেলা ২টোয় গণপ্রজাতান্ত্রিক চিন প্রতিষ্ঠিত হল, জনগণের সরকার গঠিত হল। বেলা ৩টেয় এই তিয়ান-আনমেন স্কোয়্যারে তিন লক্ষ মানুষের সামনে কেন্দ্রীয় জনতার সরকারের চেয়ারম্যান মাও সে তুং লাল নিশান উড়িয়ে নবজাত রাষ্ট্রের উদ্বোধন করেছিলেন। সেই তিয়ান-আনমেনে আজ দাঁড়িয়ে আছি আমি।

আবার এখানেই ঘটেছিল ১৯৮৯ সালে সেই বহু বিতর্কিত ঘটনা। শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যোগ দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল কিছু যুবক। বহু দলীয় গণতন্ত্রের দাবি নিয়ে এসেছিল তারা।

৫ জুন, ১৯৮৯, এক দুঃসাহসিক যুবক প্রশস্ত রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার হাতে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। তার ভাবটা এইরকম— যেন সে জানেই না যে তার পিছনে সারি দিয়ে আসছে সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক। পথের পাশে বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে মানুষ দেখছে এই দৃশ্য। সবাই আতঙ্কিত, এক্ষুনি ওপাশে সরে না গেলে ট্যাঙ্ক ওকে রাস্তার সঙ্গে পিষে একেবারে চ্যাপ্টা করে দিয়ে যাবে। ট্যাঙ্ক ওকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি ট্যাঙ্কের সামনে দিয়েই চলতে লাগল। রুদ্ধ নিশ্বাসে এ দৃশ্য দেখছে মানুষ। শেষে অপেক্ষমাণ এক পথচারী দৌড়ে এসে ছেলেটিকে টেনে রাস্তার পাশে সরিয়ে দিল।

এক বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে এই দৃশ্য টিভি-র ক্যামেরায় বন্দী করা হচ্ছিল। বিশ্ববাসী জানল, ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য ট্যাঙ্ক সতর্কতার সঙ্গেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু যা জানল না, তা হল, এই ক্যামেরার বাইরে কত ট্যাঙ্ক শান্তিপূর্ণ মিছিলের কত মানুষকে রাস্তায় মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

কে এই দুঃসাহসী ছেলেটি! ছেলেটির নাম ওয়াং উয়োউচাই, 'চিন গণতন্ত্রদলের'

প্রতিষ্ঠাতা। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। ১১ বছরের কারাদণ্ড হল। আজ সে মুক্তি পেয়ে দেশ ছাড়া।

সেই তিয়ান-আনমেনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কত বিপ্লবীর রক্ত মিশে আছে এই মাটিতে। সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়। অভূতপূর্ব বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে মানসিক উত্তেজনা অনুভব করি।

অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে মাও সে তুংয়ের আবক্ষ ছবি। কত ঔৎসুক্য, কত কৌতূহল। আনন্দতরঙ্গে মন আমার উদ্বেলিত। চিন! মাও সে তুং! তিয়ান-আনমেন! আমি দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে!

পশ্চিমের ফুটপাত ধরে আমরা চলেছি। বাঁহাতে ব্যাঙ্ক অব চায়না। চিনে থাকব অনেকদিন। বেশি করে উয়ান সংগ্রহ করে নিলাম ডলারের বিনিময়ে। ব্যাঙ্ক ছাড়িয়ে একটা ছোট রাস্তা পার হতেই সামনে মস্ত বড় এক ইমারত।

'এটা গ্রেট হল অব দ্য পিউপিল,' শিয়া বলল।

চিনের সংসদ ভবন। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে অনেকটা উঁচুতে। ভবনের চূড়ায় লাল পতাকা উড়ছে পতপত করে। সংসদ ভবনকে এক পাক ঘুরে এসে পড়লাম এক সুড়ঙ্গপথের মুখে। সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে এসে উঠলাম শান বাঁধানো বিশাল প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গনের মাঝে মাঝে ফুলের বাগান।

মাও সে তুংয়ের মূর্তিশোভিত ব্রোঞ্জের ব্যাজ, লাল পতাকা বিক্রি করছে চলমান বিক্রেতারা। একটা ব্যাজ আর একটা পতাকা কিনলাম। শিয়া একটা ব্যাজ কিনে আমাকে উপহার দিল।

এই ব্যাজ লাগিয়ে বুক চিতিয়ে চলেছি তিয়ান-আনমেন স্কোয়্যারের মধ্য দিয়ে। আয়তনে মস্কোর রেড স্কোয়্যারের থেকে অনেক বড়। সাধারণের অবসর বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত-প্রান্তর তিয়ান-আনমেন পৃথিবীর বৃহত্তম পার্ক। এর দক্ষিণপ্রান্তে আছে পাথরে খোদাই করা অপরূপ ভাস্কর্য— মুক্তি সংগ্রামে শহিদ হয়েছে কত বিপ্লবী বীর, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ— মনুমেন্ট অব দ্য পিউপিলস হিরো। তার পাশে মাও সে তুংয়ের স্মৃতিসৌধ, মেমোরিয়াল অব মাও সে তুং। তার চারপাশ ঘিরে আছে সবুজ উদ্যান। কেন্দ্রস্থলে শহিদ বেদি।

অবিরাম মানুষের যাওয়া-আসা চলছে। আবার অনেকে দাঁড়িয়ে বসে গল্প করে মোলায়েম রোদ্দুর উপভোগ করছে। অনেক ঘুড়ি উড়ছে আকাশে।

একজন ফেরিওয়ালা কিছু বই বিক্রি করছে। তিনখানা বই ব্যাগ থেকে বের করে আমার সামনে ধরল— পেইচিং, দ্য গ্রেট ওয়াল আর ফরবিডেন সিটি। হাতে নিলাম। মূল্যবান কাগজ, চিনা এবং ইংরিজিতে সুন্দর ছাপা, বহু মূল্যবান ছবি, নিখুঁত বাঁধাই। সব মিলিয়ে যে-কোনও ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করবে বইগুলো।

'কত দাম?'

'তিনটে একসঙ্গে ১৩০ উয়ান।'

'না, নেব না।' বই কটা বাড়িয়ে দিই।

বিক্রেতা বই আমার হাত থেকে নেয় না, ব্যাগ থেকে আরও একটা বই বের করে আমার হাতে দেয়। 'এটা ফ্রি।'

লাল রঙের ছোট বই। এতে আছে চেয়ারম্যান মাও সে তুংয়ের বাণী, কোটেশনস ফ্রম চেয়ারম্যান মাও সে তুং, যার পরিচিত নাম রেড বুক।

মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও আমাদের রাজ্যে এক যুবগোষ্ঠীর কাছে এই বই ছিল পবিত্র গ্রন্থের মতো। গ্রাম-শহরের দেওয়াল পাঁচিল ভরে গিয়েছিল 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বাণীতে। চারটে এত সুন্দর সুন্দর বই ১৩০ উয়ান। প্রলুব্ধ হচ্ছি। তবু বললাম, 'না।' দেখতে চাইছিলাম দাম কমায় কিনা।

'কত দেবেন?' ফেরিওয়ালা জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, '৬০ উয়ান।'

'না পারব না।' তবু সে বই আমার হাত থেকে নেয় না। আবার সাধে, '১২০ উয়ান দিন।'

আমি বুঝতে পারছি, দাম আরও কমবে। বললাম, 'না। নিয়ে নাও এগুলো।'

আমরা এগিয়ে চলি। ছেলেটি বই ফেরত নেয় না, আমাদের পিছু ছাড়ে না। দশ দশ করে কমাতে কমাতে শেষপর্যন্ত ৬০ উয়ানে রাজি হয়ে যায়।

চারটে বই ৬০ উয়ানে কিনলাম। শিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঠকেছি?'

শিয়া বলল, 'না না, খুব ভালো দামে পেয়েছেন।'

হাঁটতে হাঁটতে প্রাঙ্গণের উত্তর সীমায় এলাম আমরা। এখানে একটা বেদিতে প্রোথিত আছে পতাকা উত্তোলনের লম্বা লৌহদণ্ড। চিন গণপ্রজাতন্ত্রের পাঁচতারা চিহ্নিত লাল পতাকা উড়ছে পতপত করে। লাল কাপড়ের ওপর হলুদ রঙের একটা বড় তারাকে ঘিরে আছে ছোট ছোট চারটে তারা, চিন জনগণের ঐক্যের প্রতীক। বেদির চারপাশটা লোহার শিকল দিয়ে ঘেরা। পতাকার যথোচিত মর্যাদারক্ষায় দণ্ডায়মান আছে একজন পুলিশ। প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে পার্কের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত উঁচু লোহার রেলিং। তারপর অনেক চওড়া পথ। পথের নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেলাম ওপারে।

সামনে লাল রঙের দীর্ঘ প্রাচীর। প্রাচীর ফুটো করে তৈরি হয়েছে মস্ত বড় ফটক। ফটকের ওপর মাও সে তুংয়ের আবক্ষ ছবি আঁকা, যেটা অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রাচীরের ভেতরে আছে আরেক নগরী। তার নাম নিষিদ্ধ নগরী, ফরবিডেন সিটি। মহাপ্রাকারবেষ্টিত নিষিদ্ধ নগরীর প্রবেশদ্বার হল এই ফটক।

ফটকের নাম তিয়ান আনমেন (দ্য গেটওয়ে অব হেভেনলি পিস)— স্বর্গীয় শান্তির দ্বার। অনেকটা লম্বা প্রবেশদ্বারের পাশাপাশি পাঁচটা খিলানযুক্ত ফটক। ফটকের ওপরে প্রশস্ত অলিন্দ, অলিন্দের সমুন্নত ছাদ ঢাল হয়ে নেমেছে প্যাগোডার আকৃতি নিয়ে, তাতে হলুদ রঙের টালি বসানো, বক্রাকৃতি বর্গা, সমুজ্জ্বল রং, রক্তিম লাল দেওয়াল। অলিন্দের দুই প্রান্তে চারটে করে ছোট ছোট দণ্ডে লাল নিশান উড়ছে। মধ্যবর্তী ফটকের খিলানের ওপর মাও সে তুংয়ের আবক্ষছবি। তার দুপাশে লেখা আছে তিয়ান-আনমেন। ফটকের সম্মুখ দিয়ে গেছে পরিখা। পরিখা নিষিদ্ধ নগরীকে বেষ্টন করে আছে। পরিখার ওপর পাঁচটি শ্বেত মার্বেল পাথরের সুন্দর নকশা করা রেলিংযুক্ত সেতু পাঁচটি প্রবেশদ্বার বরাবর।

মিং ও চিং শাসনকালে সৈন্যাধ্যক্ষদের অভিযানের সময়, বিজয়ী হয়ে তাদের

প্রত্যাবর্তনের সময়, যুদ্ধবন্দীদের রাজার হাতে সমর্পণের সময় আর বর্ষপঞ্জি প্রকাশের সময় নগরীর এই প্রধান প্রবেশদ্বারে মহোৎসব হত।

ফটক দিয়ে নিষিদ্ধ নগরীর ভেতরে ঢুকলাম। বিরাট নগরীকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একেকটা ভাগে একেকটা ব্যবস্থা। সামনে আছে সংরক্ষণশালা। ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে প্রাচীন ভাস্কর্যের সংগ্রহ আছে।

শিয়া বলল, 'অনেক বড় এই নিষিদ্ধ নগরী। দেখতে পুরো একদিন লেগে যাবে। আজ আর দেখা যাবে না। চলুন এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমদামে হোটেল পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

জিজ্ঞেস করলাম,'তুমি কি কাল আসছ?'

'না, কাল তো আমার অফিস আছে। আমি আর আসতে পারব না। আপনার আর যদি কিছু করার থাকে আজই করতে হবে।'

'তাহলে শিয়া, হোটেল এখন থাক, আমি পরে খুঁজে নেব। আমি লাসায় যাব। তুমি লাসায় যাওয়ার জন্য কোথায় কী করতে হবে সেটা আমাকে দেখিয়ে দাও।'

'সেটাই ভালো। চলুন।'

একটা বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। ফুটপাতে অনেক খাবারের দোকান। শিয়া একটা বড় তরমুজ আর একটা রুটি কিনল। এর নাম লাঠি রুটি। সরু লম্বা লাঠির মতো দেখতে। একটা লাঠিকে ছিঁড়ে তিনটে বানানো হল। রুটি খেতে খেতে চলেছি তিনজনে, সামনে একটা হোটেল দেখে শিয়া ভেতরে ঢুকে গেল। ফিরে এসে বলল, ভাড়া সামান্য কম, কিন্তু ঘর ভালো না। দু-তিনটে হোটেল পাওয়া গেল। ভাড়া যদি বা কিছু কম কিন্তু ঘর পছন্দ হল না একটাও। হাঁটতে হাঁটতে এলাম মেট্রো স্টেশন।

তিন উয়ান করে টিকিট কিনে ট্রেনে উঠলাম। এই একমাত্র জায়গা যেখানে ইংরিজি চলে। ট্রেনের ভেতরে ঘোষণাগুলো হচ্ছে ইংরিজিতে। দরজার ওপরে ট্রেনের গতিপথ এঁকে স্টেশনের নাম লেখা হয়েছে, সেগুলো সব ইংরিজিতে। মোটা মোটা গোল গোল থামগুলোর গায়ে স্টেশনের নাম লেখা আছে, তার ডাইনে এবং বাঁয়ে তীরচিহ্ন দিয়ে আগের এবং পরের স্টেশনের নাম লেখা আছে, সব ইংরিজিতে।

চারটে স্টেশন পরে নামলাম শিতান। স্টেশন থেকে ওপরে রাস্তায় ওঠার সময় সিঁড়ির মুখে একটি ছেলে একটা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ভিক্ষা করছে। আর একটি লোক হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে। তার পাশে একটি শিশু ঘুমোচ্ছে। সামনে একটা বাটি, তাতে কিছু পয়সা আছে। লোকটি মাথা ওপর নীচ করে এত জোরে ঝাঁকাচ্ছে যে মেঝেতে কপাল ঠুকে যাচ্ছে। দারিদ্রের যন্ত্রণা আর বুঝি সইতে পারছে না।

ওপরে উঠে এসে মিনিট দুই হেঁটে একটা অফিসের সামনে দাঁড়ালাম। মিনহাং চোংকিউ। অফিস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শিয়া বলল,'কাল সকালে আপনি চলে আসবেন। এখান থেকে তিব্বত যাওয়ার সব ব্যবস্থা হবে। অনুমতিপত্র, প্লেনের টিকিট, হোটেল, সবই পাবেন এখানে।'

হোটেলে পৌঁছতে বেলা শেষ হয়ে গেল। পাও চা বানাতে বসল। আমি শিয়াকে বললাম, 'শিতান কীভাবে যাব, বাস নম্বর, মেট্রো স্টেশনের নাম সব একটা কাগজে লিখে দাও।'

শিয়া লিখে দিল— লিউলিচিয়াও নান থেকে ৩০০, ৩২৩ বা ৩২৪ নম্বর, যে-কোনও বাসে কোং ছু ফান যেতে হবে। সেখান থেকে মেট্রো ট্রেনে চারটে স্টেশন পরে শিতান স্টেশনে নামতে হবে। শিতান স্টেশন সাবওয়ে থেকে ওপরে উঠতে হবে। তারপর দুমিনিট হেঁটে মিনহাং চোংকিউ পাওয়া যাবে।

কিনে আনা তরমুজ কেটে পাওয়ের বানানো চা দিয়ে জলখাবার খাওয়া হল।

শিয়া বলল,'এবার আমরা যাই?'

বিমর্ষমুখে বললাম, 'চলে যাবে? আবার কবে আসবে?'

শিয়া চলে যাবে ভাবতেই পারছি না। যেন আপনজন বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছে।

'কাল থেকে তো আমার অফিস। আর আসতে পারব না। আমার ঠিকানা রাখুন।'

শিয়া ঠিকানা লিখে দিল।

ওদের সঙ্গে নীচে নেমে এলাম। গাড়িবারান্দা পার হয়ে রাস্তায় নেমে পাও হাত নাড়ল,'যাই চিয়ান।'

সরু রাস্তাটার পাশে একটা ছোট্ট দোকান। কেক, রুটি, বিস্কুট, জল পাওয়া যায়। টেলিফোন করবার ব্যবস্থাও আছে। আমার চিনা ভাষার মাস্টারমশাই ওয়ালি তাঁর মেয়ের টেলিফোন নম্বর আমাকে দিয়েছিলেন। ফোনে জামাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আমার আসার কথা। ওরা থাকে দালিয়েন— পেইচিং থেকে অনেক দূরে সমুদ্রবন্দর। ট্রেনে পাঁচ-ছ ঘণ্টার পথ। ফোন নম্বর লেখা কাগজটা পকেটেই ছিল। দোকানি মহিলার হাতে দিয়ে বললাম, 'এই লাইনটা ধরে দিন তো।'

লাইন ধরল জামাই সুকেশ নায়ার।

সুকেশকে বললাম চিনের প্রাচীর দেখার জন্য আর মঙ্গোলিয়া যাওয়ার টিকিট কেটে দেওয়ার জন্য একটা পর্যটন কোম্পানির ঠিকানা দিতে।

'আপনার হোটেলের ফোন নম্বরটা দিন। আমি একটু পরেই জানাচ্ছি।'

ইনতু হোটেলের ফোন নম্বর ওকে দিলাম।

হোটেলে ফিরে এলাম। অভ্যর্থনা টেবিলের পাটাতনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ছাং থিংথিং। ওকে বললাম, 'দালিয়েন থেকে আমার ফোন আসবে। আমার ঘরে লাইনটা দিয়ে দিও।'

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সুকেশের টেলিফোন এল।

'পেইচিং ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে একটা পর্যটন কোম্পানির অফিস আছে। এরা আপনাকে গ্রেট ওয়াল দেখাতে নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর মিস ছাং মঙ্গোলিয়ার টিকিট করে দেবে। মিস ছাংয়ের ফোন নম্বর লিখে নিন।'

ছাংয়ের টেলিফোন নম্বর লিখে নিলাম।

'আমাদের বাড়িতে আসবেন কবে?'

'যাব। আগে গ্রেট ওয়াল দেখে নিই আর মঙ্গোলিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করে নিই, তারপর।'

আজ আর কোথাও যেতে মন চাইছে না। বারবার একটা কথাই মনে আসছে— শিয়া আর আসবে না। নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে।

ছাতু পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে নৈশভোজ সেরে শুয়ে পড়লাম।

৮

সকালে উঠে নীচে নেমে ছাং থিংথিংকে জিজ্ঞেস করলাম,' ব্যাঙ্ক অব চায়না কোথায় আছে?'

ছাং বলল, 'রেলস্টেশনের কাছে। ওখানে মংকুয়োর টিকিটের খোঁজও নিতে পারবেন।'

'কীভাবে যাব?'

'বাসে চলে যান। ৬ নম্বর বাস। ১ উয়ান ভাড়া নেবে।'

একটা কাগজে নকশা এঁকে বাসের নম্বর লিখে পথনির্দেশ দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম বাসস্ট্যান্ডে।

পাঁচ মিনিট পরেই নামতে হল। ব্যাঙ্ক অব চায়না পেলাম।

একটা ফর্ম দিল। ইংরিজি ও চিনা দুরকম ভাষাতেই লেখা। তবুও এক মহিলা সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। টাকা ভাঙানোর কাজ অল্পসময়েই শেষ হল।

রাস্তা পার হয়ে দু মিনিট হেঁটে পশ্চিম পেইচিং রেলস্টেশন। চারদিক তাকিয়ে যেন চেনা চেনা ঠেকছে।

ঠিক তাই। এখান থেকেই সেদিন শিয়ার সঙ্গে অটোতে উঠেছিলাম। লিউলিচিয়াও থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট লেগেছে বাসে। শহরের পথঘাট শিয়ার ভালো করে জানা থাকলে সেদিন সহজেই হোটেল খুঁজে পাওয়া যেত, অত হয়রানি হত না। অবশ্য হয়রানিতে আমার অন্যভাবে লাভ হয়েছে। এদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রাপ্রণালী কিছুটা দেখার সুযোগ হয়েছে। তার থেকেও বড় কথা, এই যুবক ছেলেটি যে কত মহৎ তা জানা হত না যদি সেদিন আমাকে স্টেশনেই ছেড়ে দিয়ে ও চলে যেত।

অনুসন্ধান অফিস খুঁজতে খুঁজতে চলেছি। টিকিট কাটার জন্য নম্বর লাগানো একেকটা জানলা। প্রত্যেক জানলায় লাইন। লম্বা লম্বা লাইন সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। জানলার যেন শেষ নেই। ৫২ নম্বর পর্যন্ত আমার নজরে এসেছে। তারপরেও কত আছে। এরপর লাইনে যারা দাঁড়ায়নি তাদের ভিড়। যারা লাইনে টিকিট কাটতে দাঁড়িয়েছে তাদের মাথাপিছু তিনজন বা চারজন করে তো হবেই। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সব বসে পড়েছে মেঝেতে। বসার জন্য চেয়ার বা বেঞ্চি নেই। কেউবা শুয়ে আছে কাগজ পেতে অথবা কিছু না পেতে। সোজা হেঁটে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। অতি সাবধানে, মানুষের গা বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে। নদীতে উজান বেয়ে নৌকো যাওয়ার মতো। এগোতে আর পারি না। সেই প্রথমদিনে কুয়াং ছুয়ো স্টেশনে যেমনটি দেখেছিলাম, এখানকার অবস্থা তার থেকেও জটিল। যেদিকে তাকাই শুধু মানুষ আর মানুষ। এখানেই শেষ নয়, তারও পরে আছে দোতলা আর তিনতলা। সেখানে কত জানলা কত মানুষ কে জানে। কয়েকটা হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশন একসঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে এই একটার মধ্যে।

চিনের লোকসংখ্যার চাপ কিছু মালুম হচ্ছে তো?

প্রচণ্ড উচ্চনাদে মাইকে ঘোষণা চলছে। সে তো ঘোষণা নয় যেন রণহুঙ্কার।

'যাত্রীদের জানানো যাচ্ছে ...' ওইটুকুই বোঝা যাচ্ছে, বাকি অংশটুকু আর বোঝা যাচ্ছে না। আমি তো এখন যাত্রী নই, বোঝারও দরকার নেই। ১ থেকে ৫২ পর্যন্ত নম্বর লাগানো প্রতি জানলায় নজর রেখে চলেছি। কোথাও অনুসন্ধান অফিস পাওয়া গেল না। ৫২ নম্বর জানলার পর অন্দরমহলে ঢোকার পথ। ঢুকে পড়লাম। যেন মনে হচ্ছে, সাগর থেকে মহাসাগরে এসে পড়েছি।

মস্ত হলঘরের শেষপ্রান্তে একটা ছোট মঞ্চের ওপর কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চটি আধখানা রুটির মতো আধা গোল, রেলিং দিয়ে ঘেরা। বিশাল জনতার ভিড় সেখানে। সকলেই কিছু জিজ্ঞেস করছে ভদ্রলোককে। গলা বাড়িয়ে কে আগে বলতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। ভদ্রলোক ডাইনে-বাঁয়ে হেলেদুলে জবাব দিয়ে যাচ্ছে, যেন পুতুল নাচের নকিব। অনুসন্ধান অফিস হোক বা নাই হোক, এর কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে অনুমান করে ভিড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। সবাই পথ ছেড়ে দিল। সহজেই পৌঁছে গেলাম রেলিংয়ের সামনে। ভদ্রলোকের দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে।

জিজ্ঞেস করি, 'মঙ্গোলিয়ার টিকিট কোথায় পাওয়া যাবে?'

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন, '৫১ নম্বর জানলায় যান।'

যেমন সহজে ঢুকেছিলাম তেমনি সহজেই বেরিয়ে এলাম। এ হল আমার ধুতি-পাঞ্জাবির সমাদর। যেকথাটা বারবার বলতে চাইছি না পাছে পাঠকের কাছে তার মাধুর্য হারিয়ে যায়— পথ চলার সময় পথচারীদের সবার দৃষ্টি একবার আমার দিকে পড়বেই। কখনও কখনও মাথা ঝুঁকিয়ে বলি 'নি হাও'। একের বিনিময়ে অনেক মিষ্টি হাসি উপহার পাই। আমার খুব ভালো লাগে।

কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান হল না। ৫১ নম্বর জানলা থেকে নির্দেশ দিল ৪৬ নম্বরে যেতে। ৪৬ নম্বর দেখিয়ে দিল দোতলা। উঠে এলাম দোতলায়। এখানে ভিড় একটু কম, জানলার সংখ্যাও কম। আগের মতোই অনায়াসে চলে গেলাম একটা জানলার একেবারে সামনে।

ব্যাকুল আকুতি আমার, 'মঙ্গোলিয়ার টিকিট পাওয়া যাবে এখানে?'

রেলকর্মী আমার মুখপানে চেয়ে রইল।

এবার তো আমার বলায় ভুল হয়নি ভায়া। তবে কেন অমন করে চেয়ে আছ আমার দিকে। হয়তো ওর ঠিক উত্তরটি জানা নেই, কিন্তু আগের তিনজনের মতো ভুল তথ্য দিয়ে আমাকে ভাগিয়ে দিতে চাইছে না। জবাব এল লাইনে দাঁড়ানো এক যুবকের কাছ থেকে।

'বিদেশে যাওয়ার ট্রেনের টিকিট এ স্টেশন থেকে হয় না। পেইচিং স্টেশনে যান।'

তার মানে কী হল? সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি, 'এটা কি পেইচিং স্টেশন নয়?'

'এটা পশ্চিম পেইচিং স্টেশন। আপনাকে যেতে হবে পেইচিং স্টেশনে।'

আমার সকরুণ জিজ্ঞাসা, 'কোথায় সেটা?'

যুবক বলল, 'এখান থেকে ৪২ নম্বর বাসে চলে যান। আধঘণ্টা সময় লাগবে।'

এতক্ষণে মনে হচ্ছে বোধহয় সঠিক হদিস পাওয়া গেছে। কিন্তু এটাও যদি ভুল হয়, যদি সেখানে থেকে বলে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনওখানে।

তখন কী হবে? কী আর হবে, যেতে তো হবেই এবং মঙ্গোলিয়ার টিকিট পেতেই হবে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে দেখলাম এক নতুন জিনিস, যেটা ওঠার সময় নজরে আসেনি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে না নেমে যদি পাশ দিয়ে সোজা হেঁটে চলে যাই তাহলে সোজা গিয়ে পড়ব রাস্তায়। ঠিক যেমন একতলায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছি স্টেশনের মধ্যে তেমনিই দোতলার বারান্দা এসে মিশেছে রাস্তায়। বেশ মজার ব্যাপার। কেমন করে এটা হল! রাস্তায় এসে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে লম্বা রেলিং। রেলিংয়ের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে রহস্য ভেদ হল— একতলা একতলাতেই আছে, আমি দোতলায় দাঁড়িয়ে আছি। ডানদিকে অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে দেখছি। এগিয়ে যাই ওইদিকে। বা রে! এটাও একটা বাসস্ট্যান্ড। রাস্তাটা বেশ চওড়া। গোল হয়ে পাক খেয়ে খেয়ে বেশ একটু দূরে গিয়ে শহরের আসল রাস্তার সঙ্গে মিশেছে।

ওই তো দেখা যাচ্ছে একটা ৪২ নম্বর বাস দাঁড়িয়ে আছে। উঠব কী উঠব না ভাবছি। এখন বাজে তিনটে। পেইচিং স্টেশনে পৌঁছতে হবে সাড়ে তিনটে, কি তারও বেশি। তারপর সেখানে গিয়ে পড়ব ঠিক এইরকম অথবা এর থেকেও অথৈ সাগরে। সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে কত সময় লাগবে জানা নেই। ইতিমধ্যে যদি রেলের অনুসন্ধান দপ্তর বন্ধ হয়ে যায় তো সব পরিশ্রম পণ্ড, দিনটা মাটি। তার থেকে কাল সকালে গেলে কেমন হয়, নতুন উদ্যম নিয়ে লাগা যাবে। আজ বরং দিনের শেষবেলায় শহরটা ঘুরে দেখি।

ভেবেচিন্তে তাই সাব্যস্ত করা গেল।

মঙ্গোলিয়ার টিকিটের জন্য এত ঝঞ্ঝাট না পোয়ালেও চলত। আমার প্লেনের টিকিট করা আছে পেইচিং-সিওল-উলানবোতার-সিওল-তাইপেই-হংকং-ব্যাংকক-কলকাতা। তার মানে সিওলে আমাকে দুবার নামতে হবে, একবার উলান বাতোর যাওয়ার সময় আর একবার ফেরার সময়। কিন্তু আমার কোরিয়ায় ঢোকার অনুমতি আছে একবার। মুশকিল হল ওইখানে। তাহলে যাওয়ার সময় অথবা আসার সময় যে-কোনও একবার আমাকে সিওল বিমানবন্দরে বসে থাকতে হবে, শহরে ঢুকতে পারব না এবং প্রায় সাত ঘণ্টা বসে কাটাতে হবে। এই অসুবিধে দূর করবার জন্যই রেলপথে উলান বাতোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত। যদিও রেলভাড়াটা বাড়তি খরচ কিন্তু এর বিনিময়ে পাওয়া যাবে অনেক কিছু। স্বনামখ্যাত পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে। মস্কো থেকে মঙ্গোলিয়া হয়ে পেইচিং পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। মস্কো থেকে পেইচিংয়ে আসতে সময় লাগে সাতদিন। সেই ট্রেনে যাব মঙ্গোলিয়া। এই রেল যাবে উত্তর চিনের গ্রাম-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে ঘেরা মঙ্গোলিয়ার চড়াই-উতরাইয়ের পথ ধরে। স্টেশনে স্টেশনে নামব, গ্রাম্য খাবার কিনে খাব, গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলব। ভাবলেই মনটা চনমনিয়ে ওঠে। সবুর সইতে চায় না।

পেটে রাক্ষুসে খিদে। সঙ্গে লাঞ্চব্যাগ আনা হয়নি। কিছু একটা তো নিশ্চয়ই খেতে হবে। কী খাই কী খাই করতে করতে স্টেশনের বাইরে পেলাম এক ডিম-রুটির দোকান। একটা রুটি আরেকটা সিদ্ধ ডিম কিনলাম। ডিমটা ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ

মনে পড়ে গেল— কী সর্বনাশ! চিনে এসে মুরগির ডিম খাচ্ছি যে বড়। গত এক বছর ধরে সারা বিশ্ব জুড়ে সংবাদপত্রে চিন নিয়ে হই চই চলছে। পাখির ইনফ্লুয়েঞ্জা, যার নাম বার্ড ফ্লু, রোগের উৎপত্তিস্থল হল চিন। পেইচিং শহরের মুরগি এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হয়েছে। তার থেকে সংক্রমিত হচ্ছে মানুষের শরীরে। চিনে বেড়াতে গিয়ে বহু পর্যটকও আক্রান্ত হয়েছে। এইভাবে এই রোগ ছড়িয়েছে চিন থেকে কানাডা, ভারত, এশিয়ার আরও অনেক দেশে। এই রোগ নাকি ভয়ঙ্কর মানুষখেকো রোগ। পেইচিং শহরে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। সরকারি নির্দেশে লক্ষ লক্ষ মুরগি জবাই দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল রোগ প্রতিরোধের জন্য। রাষ্ট্রসংঘের স্বাস্থ্যদপ্তর 'হু' থেকে ফরমান জারি হয়েছে চিন দেশে কিছুদিন না যাওয়াই ভালো। যারা যাচ্ছে তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করে নাকেমুখে কাপড় বেঁধে দিয়ে শহরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে যাতে রোগজীবাণু শরীরে না ঢুকতে পারে। ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি ধরা পড়ে কারও শরীরে এই রোগ সংক্রমণ হয়েছে, তাহলে তার আর নিস্তার নেই। একঘরে করে রাখা হবে যত দিন না রোগ নিরাময় হয় ততদিন। চিন থেকে এই রোগজীবানু বয়ে এনেছিল দুজন ভারতীয়। রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিমানবন্দর থেকে সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল নির্বাসনঘরে। রোগমুক্তির পরে ঘরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

মাত্র কদিন আগে, জুন মাসের ২৩ তারিখে 'হু' থেকে ঘোষণা করা হয়েছে— চিন এখন সার্সের কবল থেকে মুক্ত। তাই তো ভরসা করে এসেছি। মনে মনে শপথ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, চিনে গিয়ে যা পাব তাই খাব, কিন্তু মুরগির মাংস আর মুরগির ডিম নৈব নৈব চ। সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা ছুড়ে ফেলে দিলাম আস্তাকুঁড়ে। শুধু শুধুই খেতে শুরু করলাম রুটিটা।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। লক্ষ্য স্থির করিনি। মন যেদিকে টানবে সেইদিকে যাব। বিশাল চওড়া রাস্তা, আকাশছোঁয়া বাড়ি অনেক দেখলাম। এখন দেখব সরু রাস্তা, অলি-গলি, ছোট ছোট বাড়ি, ছোট ছোট পাড়া।

এক মেয়ে হকার পেইচিং শহরের ম্যাপ বিক্রি করছে ঘুরে ঘুরে।

'কত দাম?'

মেয়েটি দু হাতের আটটা আঙুল দেখিয়ে বলল, 'পা।'

দরকষাকষি করতে করতে তিন উয়ানে কিনলাম। তখন ভাবছি, দু উয়ান বললেই ভালো হত।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিপথে ঢুকলাম। একটা বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছি। পথের দুপাশে শাক-সবজি, মাছ-মাংসের দোকান। আলু, পিঁয়াজ, বেগুন, করলা, কাঁচালঙ্কা সবই অস্বাভাবিক বড় আকারের। বিশেষ করে অত বড় পিঁয়াজ আমরা কখনও দেখতে পাই না। পিঁয়াজ নয় তো যেন ডিউজ বল। কড়াইশুঁটি, সিম, গাজর, পিঁয়াজকলি, কলমি শাক, লেটুস পাতা সবই আমাদের চেনা। অচেনা কিছু দেখলাম না। মাছের বাজারেও তাই। ছোট রুই, আমেরিকান রুই, সিলভার কাপ— এইগুলোই সব দোকানে। মাংসের বাজারে এসে ধীরপায়ে চললাম। এখানে যে কৌতূহল অনেক বেশি। দোকানে দোকানে কাচের জারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে

চলেছি। এরা তো সবই খায়, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর, ঘোড়া, ইয়াক। এদের খাদ্যতালিকা থেকে কোনওটাই বাদ যায় না। শামুক, ঝিনুক কাঁচাই খেয়ে নেয়। ডাকপাখি আর ঘোড়ার মাংসের কদর বেশি। পেইচিংয়ের ডাকপাখির মাংসের খুব নামডাক আছে। 'পেইচিং কুয়ানচুতে' এ শহরের প্রাচীনতম রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্ট গত ১৪০ বছরে ১১,৫০,০০,০০০ আস্ত ভাজা ডাক বিক্রি করেছে। হিসেব করলে পাওয়া যাচ্ছে— গড়ে দিনে ২,৭৪০ টা ডাক বিক্রি হয়েছে। এ খবর অবশ্য আমি পেয়েছি কদিন পরে, লাসায় যাওয়ার দিন বিমানবন্দরে 'চায়না ডেইলি' সংবাদপত্র থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম লিউলিচিয়াও, ২১ তলার ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে উড়ালপুলটা, সেটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেইখানে।

একটি লোক ফুটপাতের ওপর বসে আছে। তার সামনে একটা বড় কাগজ বিছানো। কাগজের ওপর কোনও পণ্য নেই। কিছু নকশা আঁকা আছে। মনে হচ্ছে যেন গণৎকার। ক্যামেরা বের করে ওর দিকে তাক করছি। লোকটি তাড়াতাড়ি কাগজটা গুটিয়ে নিল। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সে কাগজ খুলল না।

আবার এগিয়ে চলেছি। অনেক কাটা ফল বিক্রি হচ্ছে— তরমুজ, ফুটি, সিদ্ধ করা ভুট্টা।

ইনতু হোটেলের কাছে এসে পড়লাম। হোটেলের পাশেই একটা বিভাগীয় বিপণি— অ্যান অ্যান মার্কেট। দোকানের সামনে অনেক বড় খোলা উঠোন। তার ধারে ধারে ছোট ছোট খাবারের দোকান। আমিষ, নিরামিষ দুই-ই আছে। শাক-সবজি কেটে ধুয়ে রান্না হচ্ছে। আমিষ খাবারের দোকানগুলো একেকটা ছোট ছোট কাচের ঘর। ফুটফুটে মেয়েগুলো তার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন কলের পুতুল; হাত-পা নাড়ছে, মিটিমিটি তাকায়, মাংসফোঁড়া একটা শলাকা হাতে নিয়ে ইশারায় ডাকে— খাবে নাকি?

খাব তো নিশ্চয়ই। তার আগে তোমাদের ক্যামেরায় বন্দী করি। ক্যামেরা খুলতে খুলতে এগিয়ে যাই। দুই বান্ধবী কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল ফটো তোলার জন্য। কাচের মধ্যেই ওরা।

আগুনে ঝলসানো টুকরো টুকরো মাংস কাঠিতে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সাজিয়ে রেখেছে ডিশে ডিশে। 'কিসের মাংস এগুলো, সাপ না ব্যাঙ, নাকি কুকুর?'

ওরা বোঝে না আমার কথা। আবার ভুল হচ্ছে বলায়?

'চিকেন নয় তো?' এবার বুঝল। 'চিকেন' কথাটা আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে তো, তাই সবাই বোঝে।

'না, না, আমরা এখন আর চিকেন রাখি না।'

ব্যস ব্যস, চিকেন না হলেই হল। আর যা খুশি দাও। এখন আর রাখো না। তার মানে এখনও পুরোপুরি সার্সের ভয়মুক্ত নও তোমরা।

জিজ্ঞেস করি, 'কোনটা ভালো হবে?'

চাঁদের হাসিতে মুখ দুখানা ভরে গেল। দুজনেই দুটো কাঠি এগিয়ে দিল কাচের গর্ত দিয়ে। দুজনেই বলে আমারটা নাও।

'কত দাম?'

দুটো আঙুল দিয়ে দেখাল, 'এর উয়ান।'

তার মানে দুটো চার উয়ান। দুটোই নিলাম, দুটোতেই এক কামড় করে দিয়ে ইশারায় ওদের জানালাম, খুব ভালো খেতে। ওরা বেজায় খুশি।

মাংস খেতে খেতে চলে এলাম ইনতু হোটেলের সামনে।

ঘরে এসে সুকেশের দেওয়া নম্বরে মিস ছাংকে ফোন করলাম।

'নি হাও।'

'নি হাও। আমাকে উলান বাতোরের টিকিট করে দিতে পারবেন?'

'হ্যাঁ পারব। কবে যাবেন?'

'৭আগস্ট।'

'নাম বলুন আর পাসপোর্ট নম্বরটা বলুন।' নাম আর পাসপোর্ট নম্বর লিখে নিয়ে বললেন, 'আমি দশ মিনিটের মধ্যে জানাচ্ছি।'

দশ মিনিট পরেই ফোন এল।

বললেন, 'পেইচিং থেকে উলান বাতোর ভাড়া ১,৫০০ উয়ান আর ট্যাক্স ১০০ উয়ান।'

এত ভাড়া! আমার একটু সন্দেহ হল।

'আপনি ঠিক বলছেন তো পেইচিং থেকে উলান বাতোর ট্রেনে ১,৫০০ উয়ান ভাড়া?'

'ট্রেন নয় তো। আমি প্লেনে বুকিং করেছি।'

'না, না। আমি ট্রেনে যাব।'

'ঠিক আছে, পরে জানাব।'

পরদিন সকালে নীচে নেমে এসেই একটি মেয়েকে পেলাম। এক বিদেশি পর্যটকের সঙ্গে কথা বলছে। মুখ থেকে যেন ইংরিজি খই ফুটছে। দেখেই বোঝা যায়, খুব চৌকস মেয়ে। কোনওরকম ভূমিকা না করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি যার সঙ্গে কথা বলছিল তার সঙ্গে কথা শেষ করে আমাকে বলল, 'কিছু বলবেন?'

আমি বললাম,'আমাকে দুটো উপকার করে দিতে হবে।'

'বলুন।'

চিনের প্রাচীর দেখতে যাব। একটা পর্যটন কোম্পানির ঠিকানা আমার দরকার।'

'কবে যাবেন, কাল?'

'না, কাল নয় পরশু।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নম্বর টিপতে শুরু করল। লাইনে সংযোগ হতে কথা বলে বলল, 'ঠিক আছে। গ্রেট ওয়াল, মিং টোম্ব আর জেড ফ্যাক্টরি নিয়ে যাবে। পরশু নটায় আসবে। আপনি এখানে থাকবেন।'

'ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আর একটা কী বলছিলেন?'

বললাম, 'আমি মঙ্গোলিয়ার উলান বাতোর যাব। মিস ছাং নামে একজনকে

টিকিট কেটে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। এই তার ফোন নম্বর। তারপর থেকে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারছি না। তুমি একটু দেখবে লাইনটা পাওয়া যায় কিনা।'

মেয়েটি আবার মোবাইল ফোনে নম্বর টিপল। এক মিনিট কথা বলে বলল, 'ঠিক আছে, ছাং বলেছে আপনার টিকিট করে কাল দিয়ে যাবে।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম উ ইউ ফাং। এই আমার ফোন নম্বর। দরকার হলে ফোন করবেন।

একটা কাগজে নাম আর ফোন নম্বর লিখে আমাকে দিয়ে বলল, 'চলুন লাঞ্চ করি। আপনি ক্ষুধার্ত তো?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফাং হাঁটা দিল। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, না-ও বলা যায় না। চলতেই হল ওর পিছন পিছন।

ফাং পাশের রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

'কী খাবেন বলুন।'

'তুমি যা খাবে নিয়ে নাও। আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। আমি শুধু চা খাই না।'

ফাং বলল, 'তাই? আমিও তো চা খাই না।'

'বাঃ! তোমার সঙ্গে আমার বেশ মিল আছে তো।'

ফাং খাবার অর্ডার দিয়ে এল। একটা টেবিলে বসলাম দুজনে।

দুটো বড় বড় বাটিতে সুপ দিয়ে গেল। এটা হল চায়ের বিকল্প। এরপর এল দুটো বাটিতে ভাত, একটা বড় বাটি ভর্তি মাংস, আর একটা বড় বাটিতে সমপরিমাণ সবজি। সবজির মধ্যে কিছু তরিতরকারি কিছু শাকপাতা। মাংস চিকেন নয় বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কিসের মাংস বোঝা যাচ্ছে না। তা না যাক। দশদিন হয়ে গেছে চিনে এসেছি। এ কদিনে আমিও এদের মতো প্রায় সর্বভুক হয়ে পড়েছি। পাতে এখন যাই পড়ুক কোনও বাছ-বিচার না করেই সব উদরে চালান হয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা বিচার করতে হচ্ছে এখনও— চিকেন বা ডাক যেন না হয়। আর এদের রন্ধনপ্রণালী এমন চমৎকার যে কোনটা কিসের মাংস বোঝার কোনও উপায় নেই। যেটা খাই সেটাই মনে হয়, আঃ! কী খেলাম।

খেতে খেতে ফাংকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কিসের মাংস?'

ফাং চিনা নাম বলল, ইংরিজি নামটা বলতে পারল না। ওই চিনা শব্দটা আবার আমার জানা নেই। তবে বোঝা যাচ্ছে কোনও পরিচিত জন্তুর মাংস নয়। কারণ, পরিচিত জন্তু হলে ফাং নিশ্চয়ই তার ইংরিজি নামটা জানত।

ফাং খাচ্ছে কাঠি দিয়ে, আমি কাঁটাচামচ দিয়ে। মাংস বা সবজি বাটি থেকে তুলে নেওয়ার জন্য আলাদা কোনও চামচ বা কাঠি নেই। ফাং খেতে খেতে মাঝে মাঝে ওর কাঠিটা দিয়ে মাংস তুলে নিজে নিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমার পাতে দিচ্ছে। সবজিও তাই করছে। এক টেবিলে খেতে বসে চেনা অচেনা যেই হোক এরা এঁটো বিচার করে না। এটাই এদের সমাজের রীতি। পরে মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ানেও দেখেছি।

মাংস আর সবজির পরিমাণ এত বেশি যে দুজনে খেয়ে শেষ করতে পারলাম না।

খাওয়ার পর মুখ ধোওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই হোটেলে। এরা খেয়ে মুখ ধোয় না। পাশ্চাত্য রীতি-নীতিগুলো কেমন করে যেন এদেশের সমাজে ঢুকে পড়েছে।

আমি ভাবছিলাম খাওয়া শেষে বয় বিল নিয়ে আসবে। আমি বিলের টাকা দেব। তা তো এল না। ফাং উঠে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বের করে ফাংকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

'আমি টাকা দিয়ে আসি।'

ফাং বলল, 'টাকা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে।'

যা বাব্বা! এবারেও কিছু খরচ করতে পারলাম না। একটু দেঁতো হাসি হাসলাম। আর কীই বা করার আছে।

ফাং বলল, 'আমি তাহলে আসি।'

'তুমি কোথায় যাবে এখন, ফাং?'

'আমি এক্ষুনি বিমানবন্দরে যাব। সাংহাইয়ের ফ্লাইট ধরব।'

সেই শেনচেন বাসডিপো থেকে দেখে আসছি, কায়িক শ্রম হোক, বুদ্ধিমত্তার কাজ হোক, কোনওদিকে পিছিয়ে নেই এদেশের মেয়েরা, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ফাং প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

মধ্যাহ্নে বেরোলাম। শিতান যাব। শিয়ার লিখে দেওয়া কাগজটা দেখে দেখে বাসে কোং চু ফান, সেখান থেকে মেট্রো ট্রেনে শিতান। তারপর মিনহাং চোংকিউ।

প্লেনের টিকিট, লাসায় হোটেল, লাসা শহর দেখার জন্য গাইড সব ব্যবস্থা হবে এখান থেকে। তিন রাত চার দিনের জন্য হোটেলভাড়া এবং গাইডের জন্য মোট ৮৫০ উয়ান, যাওয়ার জন্য প্লেনভাড়া ২,৪৩০ উয়ান দিতে হবে। টাকা কম পড়ে গেল। কী করা যাবে।

বললাম, 'আমার কাছে ডলার আছে।'

অফিসের মহিলা বললেন, 'আমরা ডলার নিই না। কাছেই ব্যাঙ্ক অব চায়না আছে। ভাঙিয়ে নিয়ে আসুন। তাড়াতাড়ি চলে যান, ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এল।'

ছুটলাম ব্যাঙ্কের সন্ধানে। কাজটা আজ সেরে যেতেই হবে। পথে যাকেই জিজ্ঞেস করি ব্যাঙ্ক অব চায়না কোথায়, সবাই বলছে ওই তো দেখা যাচ্ছে সামনে। কিন্তু যেদিকে আঙুল দেখাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি ছুড়ে দিলে যে বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায় সেটাকে ব্যাঙ্ক বলে আদৌ মনে হচ্ছে না। রাস্তার মোড়ে বিশাল এক বাড়ি। এত বড় বাড়ি কখনও ব্যাঙ্ক হয়! এর নকশাটাই অন্যরকমের। স্থাপত্য নিদর্শন হতে পারে, মিউজিয়াম হতে পারে। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাঙ্ক অব চায়না কোনটা?'

'এটাই।'

কী বলে রে বাবা! এত বড় ব্যাঙ্ক!

পেল্লায় কাচের ফটক গায়ের জোরে ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হল।

এ কী! কোথায় ব্যাঙ্ক? এক মস্ত বড় হলঘর। ক'তলা জানি না। চার-পাঁচতলা তো

হবেই। তার মাথার ওপরে ছাদ নেই, কাচ কিংবা অন্য কোনও স্বচ্ছ বস্তুর তৈরি আচ্ছাদন। রোদ্দুর সেই আচ্ছাদন ভেদ করে মেঝে পর্যন্ত এসেছে। চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির দুপাশে বহু মানুষ অলসের মতো বসে আছে। দেখেই বোঝা যায়, এরা কেউ ব্যাঙ্কের সঙ্গে টাকা-পয়সা লেনদেন করতে মোটেই আসেনি। মনে হচ্ছে শহরের যত ভবঘুরে এইখানে এসে জুটেছে, আরামে সময় কাটাবার জায়গা পেয়েছে বেশ।

ওদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাঙ্ক কোথায়?'

অলস ভঙ্গিতেই সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওপরে।'

উঠে গেলাম ওপরে। তাই তো সত্যিই তো ব্যাঙ্ক। কত যে জানলা তার যেন শেষ নেই। ঠিক জানলা নয়, মানে কাচে ঘেরা বা জাল দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট খুপরি নয়। সবই খোলামেলা। খিলানের গায়ে গায়ে নম্বর লিখে লিখে বোঝানো হয়েছে একেকটা আলাদা দপ্তর। প্রত্যেক দপ্তরের সামনে একটা করে গোল টুল। ভিড় নেই, দু-চারজন করে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কত নম্বরে গেলে কী কাজ হবে লেখা আছে। ঠিক জায়গাটা খুঁজে নিয়ে বসলাম। ট্র্যাভেলার্স চেক আর পাসপোর্ট এগিয়ে দিতে পাঁচ মিনিটেই কাজ হয়ে গেল।

হনহন করে এসে গেলাম মিনহাং চোংকিউ। টাকা দিলাম। হাতে লেখা একটা কাঁচা রসিদ দিয়ে মহিলা বললেন, 'আপনার ফোন নম্বরটা দিন। লাসা প্রবেশের অনুমতি এসে গেলে আপনাকে জানিয়ে দেব। অনুমতি না এলে টাকা ফেরত পাবেন।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই নামল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। ছাতা নেই সঙ্গে। অপেক্ষা করতেই হল।

বর্ষণের ধারা হালকা হলে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বসে আছি বিশ্রামের জায়গায়। অপেক্ষা করছি মিস ছাংয়ের জন্য। উলান বাতোরের টিকিট দিয়ে যাবে। দেরি দেখে ফোন করলাম। মিস ছাং জানালেন এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে লোক আসবে। অগত্যা বসে থাকতে হল।

সাড়ে এগারোটায় একটি ছেলে এল টিকিট নিয়ে। ট্রেনভাড়া ৬৫৬ উয়ান আর ছাংয়ের পারিশ্রমিক ৫০ উয়ান দিয়ে দিলাম।

৯

আজ ২২ জুলাই। মহাপ্রাচীর দেখতে যাব।

৯টার আগেই নীচে নেমে এসে বিরামের জায়গায় বসেছি। একটি মেয়ে এসে আমার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করল।

'হ্যাঁ আমি।'

মেয়েটি বলল, 'আজ আমি আপনার গাইড। আমার নাম ভিভিয়েন ওয়াং। চলুন, গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

গাড়িতে উঠে বসলাম। ভিভিয়েন ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দিল। গাড়িতে

আমরা দুজন। আর কোনও যাত্রী দেখছি না।

'আমি একাই যাব? আর কোনও পর্যটক নেই?' ভিভিয়েনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'মিস্টার ফান আমাকে সেইরকমই বলেছেন।' একটু থেমে বলল, 'আপনি একা যাচ্ছেন বলেই তো এত টাকা নিচ্ছে। একা করলেন কেন? কোনও ট্যুর কোম্পানির গ্রুপের সঙ্গে যেতে পারতেন। যা দিচ্ছেন তার অর্ধেক টাকায় হয়ে যেত।'

'কী করব বলো, কোনও ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। মিস্টার ফানকে আমি চিনি না। ওর সঙ্গে আমার মৌখিক কথা হয়নি। টেলিফোনে কথা হয়েছে। আমাকে বলেননি এটা গ্রুপের সঙ্গে ট্যুর নাকি আমি একা। আর আমার হোটেলের কাছে কোনও ট্যুর কোম্পানি দেখতে পাইনি।'

'আপনি যে হোটেলে আছেন সেটাও তো খুব দামি তাই না?'

'হ্যাঁ, খুবই বেশি। এখানকারই একটি ছেলে ঠিক করে দিয়েছে। সে কমদামের কোনও হোটেল পেল না খুঁজে।'

'আর কতদিন আছেন এখানে?'

'এখনও পনেরো-ষোলদিন।'

ভিভিয়েন বলল, 'ঠিক আছে, আমি আপনাকে অনেক কমদামের হোটেল ঠিক করে দেব।'

'দেবে খুঁজে? তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

পেইচিং শহর ছাড়িয়ে গাড়ি চলেছে। বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ডানদিকে ঘুরে তরুবীথির পথ ধরেছে। পথের দু ধার সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত, মাথার ওপর ডালপালা ছড়ানো বনস্পতির স্নিগ্ধ ছায়া। মাঝে মাঝে পুরাকালের প্রস্তরমূর্তি বসানো আছে। ভিভিয়েন বলল, 'এ জায়গার নাম তিংলিং। এখানে আছে মিং রাজবংশের সমাধিক্ষেত্র।

গাড়ি থামল এক বড় ফটকের সামনে।

ফটক পার হয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার। প্রবেশপথের ওপর ড্রাগনের মূর্তি খোদাই করা। ভেতরে যেতে হলে এই মূর্তির ওপর দিয়েই যেতে হবে। দরজা অতিক্রম করে ভেতরে গেলে সামনে সমাধিক্ষেত্রের একটা নকশা আঁকা আছে দেখা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে তিনশো বছর রাজত্ব করেছে মিং রাজবংশ। এই রাজবংশের ১৩জন প্রধান রাজা-রানির সমাধি তৈরি হয়েছে ৪০ বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে। রাজবংশের ত্রয়োদশ সম্রাট ছু ই চুনের দাপট ছিল সবথেকে বেশি। তার এবং তার দুই সম্রাজ্ঞীর সমাধির আয়তন হল ১,৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার। কার সমাধি কোথায় আঁকা আছে নকশায়।

সমাধি ছাড়া ভূগর্ভে আছে মস্ত রাজপ্রাসাদ। ভূপৃষ্ঠে তিনতলা প্রাসাদের ছাদ। আমরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। নীচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলায় নেমে গেলাম। চারটে বড় বড় ঘর মিলিয়ে প্রাসাদ। প্রত্যেক ঘরে আছে এক একজন সম্রাট কিম্বা সম্রাজ্ঞীর সমাধি। সমাধি খনন করে পাওয়া গেছে কফিন। কফিনের মধ্যে পাওয়া গেছে বহু মূল্যবান অলঙ্কার।

সম্রাট ছু ই চুনের কফিনটি খোলা। তার মধ্যে জেড রত্নে নির্মিত বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি রাখা হয়েছে। এইসব অলঙ্কারসমেত রাজা-রানিদের সমাধি দেওয়া হত।

দর্শকরা সমাধির ওপর পয়সা টাকা ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। প্রচুর নোট পথের ওপর ছড়ানো আছে।

মিং সমাধি থেকে আসা হল জেড রত্নের কারখানায়। হিরের মতো মূল্যবান বৈচিত্রময় খনিজ পাথর জেড। প্রকৃতিতে ঠান্ডা এবং শক্ত, কিন্তু দৃশ্যত মনে হবে কোমল। জেডের ওপর কারুকার্য করে তৈরি হচ্ছে বাসনপত্র, ঘর সাজাবার জিনিস আর গয়না। বড় একটা হলঘরের চারপাশে ছোট ছোট কাচে ঘেরা ঘর। একেকটা ঘরে একেকজন শিল্পী চিত্রিত করছে জিনিসগুলো। জেড নিয়ে অনেক রূপকথা প্রচলিত আছে চিন দেশে। প্রাচীন চিন দেশের মানুষ বিশ্বাস করত জেডের জীবনীশক্তি আছে এবং এর সাহায্যে স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি গোলাকার বস্তু আর পৃথিবী হল চৌকো। তাই তারা জেড দিয়ে গোল চাকতি আর চৌকো নল তৈরি করত।

এর পাশে আরেকটা ঘর হিরের। যন্ত্র দিয়ে কাটা হচ্ছে হিরে, তৈরি হচ্ছে হিরের গয়না। হার, দুল, চুড়ি, বালা, মালা আরও কত মূল্যবান গয়না সাজানো আছে কাচের আলমারিতে। কিনছেও অনেকে।

পাশেই তামার কারখানা। একটা চুল্লিতে তামা গলিয়ে শোধন হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে তামার গয়না, বাসনপত্র।

এর গায়ে লাগানো 'বন্ধুত্বের দোকান', ফ্রেন্ডশিপ স্টোর। বই, খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল, খেলার সাজসরঞ্জাম, ঘরকন্নার জিনিস, সব পাওয়া যায় এই দোকানে। পেইচিংয়ে গেলেই দু-চারটে ফ্রেন্ডশিপ স্টোর দেখতে পাওয়া যাবে।

দোকানের ওপরের তলায় রেস্টুরেন্ট। ভিভিয়েন বলল, 'চলুন, এখন আমরা লাঞ্চ করব।'

বেশ বড় খাবার জায়গা। পাঁচ-ছজন করে ঘিরে বসেছে একেকটা গোল টেবিলকে। এমন বিশ-পঁচিশটা টেবিল তো আছেই। গুনলে আরও বেশিই হতে পারে। চিন-জাপানের মানুষ তো আছেই, ইউরোপ-আমেরিকার মানুষও দেখছি অনেক। অন্য দেশের মানুষ এই প্রথম দেখছি এ শহরে।

একটু তফাতে একটা টেবিলে একজন ভারতীয় বসেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় যুবক, কৃষ্ণমূর্তি। এক ব্যবসায়ী সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। ওর কাছ থেকেই জানলাম ভারতের সঙ্গে চিনের বাণিজ্য দিনদিন বেড়ে চলেছে। ১৯২২ সালে যেখানে ৭০ মিলিয়ন ডলার, ২০০১ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ২.৩ বিলিয়ন ডলার। আরও বাড়বে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চিন আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। আমেরিকার সঙ্গে এদের ঢালাও বাণিজ্য চলছে। আমেরিকায় বাচ্চাদের খেলনার বাজার তো চিন কব্জা করে ফেলেছে। প্রতি তিনটে খেলনার মধ্যে দুটো হল চিনের তৈরি। তারপর সুটকেস, ব্যাগ, জুতো, জামাকাপড় এসব জিনিসের চিনের বাজার সারা পৃথিবী জুড়ে।

ভিভিয়েন হাঁক দিল, 'এখানে এসে বসুন।'

গল্প আর হল না।

টেবিলের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে চলেছি। সবারই নজর পড়ছে আমার ধুতি-পাঞ্জাবির দিকে।

টেবিলে খাবার এসে গেছে।

ভিভিয়েন বলল, 'আপনি খান বসে। খাওয়া হয়ে গেলে নীচে চলে আসবেন।'

'তুমি খাবে না?'

'আমি ড্রাইভারের সঙ্গে খাব।'

খাবারের পরিমাণ দেখে ভেবেছিলাম দুজনের খাবার। গোটাদশেক ডিশে সাজানো খাবার। ভাত, নুডল, সুপ, মাছ, মাংস, তরকারি, স্যালাড। একটা বড় চামচ, আর একটা ছোট কলাই করা চামচ, দেখতে কুশীর মতো, অনেকটা ঝোল তোলা যায়। চায়ের বদলে সুপ। কলাই করা চামচ দিয়ে এক চামচ সুপ তুলে চেখে দেখলাম। ঠিক যেন সেই ছোটবেলায় মায়ের তৈরি করে দেওয়া পাঁচন খাচ্ছি। খুসখুসে কাশি হলে গলায় বেশ আরাম বোধ হয়।

মাংস আছে পাঁচরকমের। বাদাম দিয়ে রান্না করা মাংস, শাকপাতা দিয়ে রান্না করা মাংস, কষা মাংস, রোস্ট করা মাংস, মাংসের ঝোল। আহা! কী রান্না। চেটেপুটে শেষ করছিলাম একটা একটা করে বাটি।

একটি মেয়ে আরও দুটি বাটি নিয়ে এসেছে। এখনও দেওয়া শেষ হয়নি! টেবিলে আর জায়গা নেই। কোথায় রাখবে। যে কটা বাটি খালি হয়েছে সেই কটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল বাটিদুটো। একটা বাটিতে আছে পুলিপিঠের মতো গোটাচারেক। আরেকটা বাটিতে ঝোলা গুড়ের মতো দেখতে কিছু একটা। মেয়েটি দুটো বাটি দেখিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে ওটা খেতে হয়।'

জিজ্ঞেস করি, 'মিষ্টি না ঝাল?'

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলে, 'মিষ্টি।'

একটু চেখে দেখলাম। পিঠেই বটে। ভেতরে পুর দেওয়া।

খালি করে এনেছি প্রায় সব বাটিগুলো। শেষ প্রস্থে এল আরও চারটে বাটি। এতে আছে বাদাম ভাজা, তরমুজ, শশা, আনারস।

চেটেপুটে সব খেলাম। উদরে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

ভিভিয়েন এখনও আসেনি। নীচে নেমে এলাম। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম হিরে মণি মুক্তোর অলঙ্কার। খুব ভিড়। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে অনেকে। কিনছেও কেউ কেউ। দাম শুনে আমার তো হাত দিতেই ভয় করছিল।

ভিভিয়েন এল।

'একটু দেরি হয়ে গেল। দেখুন না, ক্যাশে যারা বসেছে সবাই অ্যাক্রোব্যাট করে। টাকা নেবে কী, কসরত দেখাতে লেগে গেছে।' বলতে বলতে ভিভিয়েন হেসে ফেলে।

গাড়ি ছুটেছে শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে। দেখতে দেখতে গ্রামও শেষ হয়ে গেল। চলেছি পাহাড়ি পথ ধরে।

'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি, ভিভিয়েন?'

'গ্রেট ওয়াল। এসে গেছি। ওই তো দেখা যাচ্ছে।'

গাড়ি ডানদিকে ঘুরল। এখন অনেকটা কাছে এসে গেছি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মহাপ্রাচীর। উঠতে উঠতে উঠে গেছে কত উঁচু এক চূড়ায়, নামতে নামতে মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে, আবার উঠতে উঠতে উঠেছে আরও আরও ওপরে একেবারে সর্বোচ্চ চূড়ায়। এঁকেবেঁকে কত দূর চলে গেছে। তার শেষ নেই। যেন, পাহাড়ের গায়ে লেপটে আছে এক বিশাল অজগর।

গাড়ি থামল সিঁড়ির মুখে। প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কত মানুষের ভিড়। সিঁড়ির মুখে একটা স্তম্ভ। সবাই ছবি নিচ্ছে ওখানে দাঁড়িয়ে। স্তম্ভের গায়ে নিজের নাম লিখে দিচ্ছে অনেকে। আমিও লিখে দিলাম আমার নাম। বাংলায় লিখলাম, যদি কোনও বাঙালি আসে, জানবে আমার নামটা। কত মানুষ উঠছে, মেয়ে, পুরুষ, প্রৌঢ়, যুবা, কিশোর, শিশু। সবাই উঠছে, কেউ কেউ নেমেও আসছে। গেঞ্জি আর শর্টস পরা ভিভিয়েন তরতর করে উঠে যাচ্ছে। ওর বয়সের দুগুণ যোগ পনেরো সমান আমার বয়স। হোক না। আমিও পারি। বাঁহাতে ধুতিটা উঁচু করে নিয়ে পাল্লা দিয়ে উঠে চলেছি। একটু পরে ভিভিয়েনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কে এগিয়ে কে পিছিয়ে পরে দেখা যাবে।

অনেক চওড়া প্রাচীর। পাঁচ-সাতটা মানুষ পাশাপাশি উঠে যেতে পারে। ওই উঁচু পাহাড়ের ওপর পাথর তুলে তুলে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে এই কাণ্ড হয়েছে। বড় বড় পাথরের চাঁই কেটে কেটে পাতলা করে বসিয়ে সিঁড়ি বানিয়েছে। দুপাশে আলসের মতো উঁচু করে মজবুত গাঁথুনি দেওয়া আছে। পড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। ভাবতে অবাক লাগে আড়াই হাজার বছর আগে কেমন করে সম্ভব হয়েছিল এই অকল্পনীয় কর্মকাণ্ড। শুধু কি গায়ের জোর! বুদ্ধির জোর ছিল তার থেকে অনেক বেশি।

৫,০০০ কিলোমিটার লম্বা। পুবে চিহলি উপসাগরের কূল থেকে শুরু করে পশ্চিমে মধ্য এশিয়ায় গোবি মরুভূমি পর্যন্ত চলে গেছে এই মহাপ্রাচীর। খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল প্রাচীর তৈরির কাজ। গোড়ায় ছোট ছোট সাম্রাজ্যের রাজারা নিজ নিজ রাজ্যরক্ষার জন্য তৈরি করেছিল একেকটা প্রাচীর। ২২১ খ্রিস্টপূর্বে রাজা শিহ হুয়াং তি ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে বিশাল সংযুক্ত চিন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, আর সেইসঙ্গে টুকরো টুকরো পাঁচিলগুলিকে জুড়ে এক অখণ্ড প্রাচীরের রূপ দিল। প্রাচীরের নির্মাণকাজ শেষ হল মিং রাজাদের রাজত্বকালে সপ্তদশ শতকে। প্রায় দুহাজার বছরে গড়ে উঠেছে মহাপ্রাচীর। দুর্গের আকারে দেশের উত্তরদিকটা ঘেরা হয়ে গেল। একেকটা চূড়ায় তৈরি হল একেকটা নজরদারির কুঠুরি। ৩০ ফুট উঁচু পাঁচিল আর নজরদারির চূড়াগুলো ৪০ ফুট। ওখান থেকে নজর রাখা যায় বিদেশি শত্রুর গতিবিধির ওপর। উদ্দেশ্য ছিল হূনদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। বিপদের আঁচ পেলেই দিনের বেলায় চূড়ায় চূড়ায় ধোঁয়া দিয়ে আর রাতের বেলায় আগুন জ্বেলে দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সংকেত পাঠিয়ে দেওয়া হত— তৈরি হও, শত্রু আসছে।

পাঁচিল দিয়ে শত্রু ঠেকানো? এ কি বাগানে বেড়া দিয়ে গরু-ছাগল আটকানো? এত করেও কি বিদেশি আক্রমণ ঠেকানো গেছে? কত বিদেশি এল, লুটপাট করে

নিয়ে গেল। সেই উত্তরদিক থেকেই মাঞ্চু রাজারা ঢুকে দখল করল দেশটা, রাজত্ব করে গেল তিনশো বছর। কত অর্থ, কত শ্রম ব্যয় হয়েছে এর পিছনে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তবু বলব বেবাক জলে যায়নি। এই বিশাল কর্মকাণ্ড হয়ে রইল প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন। এ তো শুধু চিনের গৌরব নয়। তামাম দুনিয়ার সেরা ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে মহাপ্রাচীর। সেও কি কম কথা!

হাল আমলে সংস্কার সাধন হয়েছে দেশ-বিদেশ থেকে প্রাচীর অভিযানে যারা আসে তাদের সুবিধার জন্য। আলসের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছে ইস্পাতের পাইপ নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত। পাইপ ধরে ধরে উঠতে বেশ সুবিধে হয়। বাঁহাতে ডানহাতে ধুতি বদল করে করে এক দমে চলে এলাম একটা চূড়ায়। এক্কেকটা চূড়া মানে বিশ্রামের জায়গা। বসে জিরিয়ে নিই।

শিশু কোলে নিয়ে কত মহিলা উঠে যাচ্ছে। আমি পারব না? নতুন উদ্যম নিয়ে আবার শুরু করি উঠতে। আলসের পাশ দিয়ে গাছের পাতা মাথা ছুঁয়ে যায়। আরেকটা চূড়ায় এসে পড়লাম। আর পারি না। হাঁপিয়ে যাই। বসে পড়ি। একটু বিশ্রাম নিয়ে আলসে ধরে দাঁড়াই। যতদূর দেখা যায় উঠতে উঠতে কত উঁচুতে উঠে গেছে প্রাচীর। ওখানে উঠলে বুঝি আকাশ ছোঁয়া যাবে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় গাছ। সবুজে সবুজ চারদিক। দূরের চূড়াগুলো কুয়াশায় ঢেকে যায়। হালকা কুয়াশা ভেদ করে দেখা যায় আবছা চূড়াগুলো। রহস্যময়ী হয়ে ওঠে জায়গাটা। চারদিকে সীমাহীন প্রশান্তি।

সামনে এক সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সুড়ঙ্গ পার হয়ে উঠে এলাম আরও খানিকটা ওপরে। এখানে পাঁচিল সমতলে চলেছে কিছুটা পথ। তারপর আবার খাড়াই উত্তুঙ্গ চূড়া। ওইখানে দেখা যাচ্ছে একটা ঘর। বিশ্রামের ঘর কিংবা রেস্টুরেন্ট হবে বোধহয়। এগিয়ে যাই ওই পর্যন্ত। বাড়িটার দেওয়ালে লেখা আছে 'THE CERTIFICATE FOR CLIMBING UP THE GREAT WALL'.

বেলা শেষ হয়ে এল। নীচে নেমে এসে দেখি ভিভিয়েন স্তম্ভটার কাছে অপেক্ষা করছে।

'কতদূর উঠেছিলেন?'

'ওই যে দেখছ একেবারে ওপরের চূড়াটা, তার আগেরটা পর্যন্ত।'

ভিভিয়েন অবাক, 'অত উঁচুতে! আপনি এখনও খুব ইয়ং আছেন দেখছি।'

'তুমি ওপরে উঠলে না যে?'

'আমাকে তো রোজই একবার করে উঠতে হয়। তাই আর বেশি উঁচুতে যাইনি।'

নেমে যাই দুজনে।

'কেমন লাগছে পেইচিং?' ভিভিয়েন জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'খুব ভালো লাগছে। তবে একটাই অসুবিধে— এখানে ইংরিজি বলার লোক খুব কম। আট-দশদিন হয়ে গেল এসেছি। শুধু তোমাকে পেলাম আর তোমাদের এই কোম্পানির সঙ্গে যে মেয়েটি যোগাযোগ করে দিয়েছিল উ ইউ ফাং। মাত্র এই দুজন। হোটেলের একটি মেয়ে থিংথিং কোনওরকমে কাজ চালাবার মতো

বলতে পারে। আমি খুব অল্পই তোমাদের ভাষা জানি। তাই বেশ অসুবিধে হচ্ছে।'

'আপনি কি আবার আমাদের দেশে আসবেন?'

'আসব, তবে তোমাদের ভাষাটা আরও ভালো করে আয়ত্ত করে নিয়ে, তারপর।'

ভিভিয়েন বলল, '২০০৮ সালের পরে আসবেন। তখন আর এই অসুবিধেয় পড়তে হবে না।'

'কী করে এত নিশ্চিত হয়ে কথাটা বললে?'

'২০০৮ সালে এখানে অলিম্পিক খেলা হবে। অনেক বিদেশি আসবে। অনেক গাইড দরকার হবে তখন। তার জন্য আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরিজি শিখতে শুরু করে দিয়েছে। চারবছরে সবাই শিখে ফেলবে।'

ভাবতেও ভালো লাগে, নিজের দেশের ওপর, দেশের মানুষের কত আস্থা।

হোটেলে ফিরতে সন্ধে হল।

'আমাকে হোটেলের সন্ধান কবে দেবে, ভিভিয়েন?'

'কাল পারব না। কাল আমার একটা গ্রুপ আছে। পরশু সকালে আসব। আপনি থাকবেন।'

ভিভিয়েন চলে গেল।

সকালবেলায় বেরলাম মিনহাং চোংকিউ। তিব্বত পর্যটন অফিস থেকে সংগ্রহ করলাম লাসা যাওয়ার টিকিট আর অনুমতিপত্র। ২৮ জুলাই সকাল ৯টায় প্লেন। লাসা যাওয়া নিশ্চিত হল, তবে একটু সমস্যা রয়ে গেল— ফেরার টিকিট দেয়নি, লাসা গিয়ে করতে হবে। মানসিক উদ্বেগ কেটেছে। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলে চেপে মঙ্গোলিয়া যাওয়া নিশ্চিত হয়েছে। লাসা ভ্রমণের ব্যবস্থাও আজ হয়ে গেল। আরও ষোলদিন থাকব এদেশে। তার মধ্যে চারদিন লাসা।

শিতান মেট্রো স্টেশন থেকে মিনহাং চোংকিউ আসার পথে গত দুদিন ধরে একটা বাড়ি লক্ষ করছি। খুব বড় বাড়ি। তার মাথায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় ইংরিজি হরফে লেখা আছে BEIJING BOOK BUILDING, বাড়িটার সামনে অনেক চওড়া ফুটপাতের ওপর স্থাপিত আছে অনেকগুলো বই একের ওপর এক তার ওপর আর এক, এমনি করে অগোছালোভাবে রাখা হয়েছে অনেকগুলো বই— কালো পাথর দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য। প্রবেশদ্বারে বহু মানুষের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। এত বড় বইয়ের দোকান হবে? সন্দেহ হয়। তাই ধরে নিয়েছিলাম এটা একটা গ্রন্থাগার। দর্শনের প্রথমদিন থেকেই কৌতূহল বোধ করছিলাম। কিন্তু সুযোগ করা যায়নি কৌতূহল মেটাবার। আজ হাতে অনেক সময়। ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

বড় একটা হলঘর। পুরো ঘরে সাজানো আছে বড় বড় কাঠের তাক। একেকটা তাক লম্বায় ছফুট আর চওড়াও ততটাই হবে। কতগুলো তাক আছে গোনা যায় না। যেন তাকের গোলকধাঁধা। কোনটা থেকে কোনটায় যাব দিশে পাওয়া যায় না, কোন তাক দেখা হল কোনটা দেখা হল না মনে রাখা যায় না। একেকটা তাকে আছে সাতটা করে থাক। প্রত্যেক তাকের প্রতিটি থাকে কী বিষয়ের বই আছে তা লেখা আছে ইংরিজিতে। ব্যস ওই পর্যন্তই ইংরিজি। আর কোথাও ইংরিজি লেখা নেই। কোনও কোনও তাকে দুয়েকজন পড়ুয়া তাক থেকে বই নিয়ে তাকের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

পড়ছে, কেউ কেউ নীচে বসে পড়ে খাতায় নোট করছে। এক জায়গায় লাইন দিয়ে রাখা আছে ছোট ছোট ট্রলি। ট্রলির ওপর বসানো আছে প্লাস্টিকের ঝোলা। বড় বড় বিভাগীয় দোকানে যেমন হয়, ক্রেতারা ঝোলা ভর্তি করে জিনিস নিয়ে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ক্যাশ কাউন্টারের দিকে যায় দাম দিতে, ঠিক সেইরকম। সবাই একটা করে ট্রলি নিয়ে এ তাক থেকে সে তাক থেকে দুটো-একটা করে বই নিয়ে নিয়ে ঝোলা ভর্তি করছে। পাঁচটা-সাতটা করে বই একেকজনের ঝোলায়। তারপর যায় কোথায় দেখার জন্য একজনের পিছু নিলাম। তাকের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে চলল সে ডানদিকে। একটু এগিয়ে আবার ডাইনে ঘুরতেই চোখের পাতা আমার পড়ে না। লম্বা এক কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপর রাখা আছে পাঁচখানা কম্পিউটার যন্ত্র। একেকটা যন্ত্রের সামনে লাইন পড়েছে। প্রত্যেক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আটদশজন করে। তবে কি এখান থেকে সদস্যদের বই বিলি হচ্ছে? কাছে এগিয়ে যাই। ঝোলা থেকে বই তুলে টেবিলের ওপর কম্পিউটারের পাশে রাখছে একেকজন করে। প্রত্যেক কম্পিউটারে বসে আছে একেকটি মেয়ে। তারা বইয়ের মলাট উল্টে দাম দেখছে। যন্ত্রে দাম হিসেব করে ছাপানো রসিদ দিচ্ছে, টাকা নিচ্ছে, প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে বই দিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণে সন্দেহভঞ্জন হল— এটা গ্রন্থাগার নয়, দোকান। বইয়ের দোকানের মধ্যে বইয়ের তাক থেকে বই নিয়ে খাতায় নোট করছে ছাত্রছাত্রীরা, এ যেন গ্রন্থাগার। আহা! ভারতের বিদ্যার পীঠস্থান কলকাতায় ছাত্রছাত্রীরা এমন সুযোগ যদি পেত। একটা বড় টেবিলের ওপর প্রচুর বই ছড়ানো আছে। এসব বই নতুন এসেছে। বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে একটা বই বেরিয়ে পড়ল। তার মলাটের ওপর গান্ধিজির ছবি আঁকা।

হলঘরের মাঝখান থেকে এসকালেটর উঠে গেছে। দোতলায় উঠলাম। দোতলায় উঠে দেখি আমার পাঞ্জাবির একটা হাতায় কোথা থেকে কালো রং লেগে একেবারে কালো হয়ে গেছে। আমি দেখছি পিছন ফিরে কোথা থেকে লাগল। একজন বলল এসকালেটরের হাতলের কাঁচা রং লেগেছে। সকলে দেখছে আমাকে। কী করব ভাবছি, কোথা থেকে একটা মেয়ে দৌড়ে এল।

‘খুব দুঃখিত। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।’ বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বলল, ‘ধুয়ে নিন।’

দোতলাতেও সমপরিমাণ বইয়ের আয়োজন। চার-পাঁচটা ক্যাশ কাউন্টারে একইরকম ভিড়। এক জায়গায় টিভিতে চিনা ভাষা শেখানো চলছে। ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস হচ্ছে। চিনা ভাষায় একটি শব্দকে চাররকমভাবে উচ্চারণ করলে তার মানে চাররকম হয়। সেই উচ্চারণবিধি শেখানো হচ্ছে। ক্যারেক্টার লেখা শেখানো হচ্ছে। খুব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। দেখতে বেশ ভালো লাগছিল।

ছাতু পিঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে প্রাতরাশ করে বেরিয়েছি সকাল ৯টায়। এখানে পৌঁছতে সময় লেগেছে আধঘণ্টা। তিব্বত পর্যটন দপ্তরের কাজ শেষ করতে লেগেছে আর পনেরো মিনিট সময়। তারপর থেকে ঘুরছি বইয়ের তাক থেকে তাকে। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা, তিনতলা থেকে চারতলায় এসেছি। এখন বাজে বেলা দুটো। এখনও পাঁচতলায় যাওয়া বাকি আছে। অনুমান করতে পারছেন

কত বই আছে? আমাদের গর্বের কলেজ স্ট্রিট আর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সব দোকানের মজুত বই এই একটা দোকানে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরও বেশকিছু জায়গা খালি পড়ে থাকবে। তার থেকেও বিস্ময়ের কথা হল, মোট বইয়ের সংখ্যা পাঁচ অঙ্কের অথবা ছ অঙ্কের যাই হোক, চিনা ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় লেখা একটিও বই নেই। শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার স্তর পর্যন্ত কোনও বিষয়ের বই বাদ নেই, বিদ্যার কোনও শাখা, কোনও উপশাখার বই বাদ নেই। সবই চিনা ভাষায়। প্রতিটি বইয়ের ছাপা, কাগজ, বাইরের চাকচিক্য এত আকর্ষণীয় যে হাতে নিলেই কিনতে ইচ্ছে করে।

বিদেশি সাহিত্যের বই? অঢেল। ইংরিজি, ফরাসি, জার্মানি, স্পেনীয়, রুশ, জাপানি, আরবি এই কটা নাম নজরে এসেছে। আরও কত ছিল কী জানি। পশ্চিমের শেক্সপিয়ার, শ, ডিকেন্স থেকে শুরু করে রুশো, রম্যাঁ রলাঁ, দান্তে, শিলার, গ্যেথে, হয়ে পুবের তলস্তয়, পুশকিন, গোর্কি, চেখভ পর্যন্ত সব সাহিত্যের বই চিনা ভাষায় অনূদিত। এইসব ভাষা শেখাবার বইগুলোও সব চিনা ভাষায়।

চিনা ভাষাশিক্ষার বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। একেকটা থাক থেকে একটা একটা করে বই নামিয়ে নামিয়ে দেখছিলাম। স্বদেশি, বিদেশি, সবরকম শিক্ষার্থীদের চিনা ভাষা শেখাবার কত বিচিত্র ধরনের বই! দেখতে দেখতে তাজ্জব বনে যাই। আমাদের যে বই পড়ানো হত তার থেকে অনেক ভালো বই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিনা ভাষা শিক্ষিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য বলছিলেন, শেখানোর জন্য ভালো বই নাকি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আমার ইচ্ছে করছিল সবরকম বই দুটো-একটা করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে আর আমার শিক্ষক ওয়ালিকে উপহার দিই।

চিনা ভাষায় অভিধান— তার সংখ্যাও অগণন। অবাক কাণ্ড। একটা ভাষায় এতরকম অভিধান থাকতে পারে কল্পনায় আসে না। একটা অভিধান কেনার বড় শখ। কলকাতায়, দিল্লিতে কোথাও পাইনি। পছন্দ করলাম একটা চিনা-ইংরিজি-চিনা অভিধান। নাম, দাম লিখে নিলাম। পয়সা যদি বাঁচে এ দেশ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে কিনে নিয়ে যাব।

তিনটে বাজে। শূন্য পাকস্থলী বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। তবু এই বিদ্যার আকর থেকে বেরিয়ে যেতে মন চাইছে না। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে খাবার আছে— চিঁড়ে ভাজা, চানাচুর, বিস্কুট। কিন্তু খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না।

উঠলাম পাঁচতলায়। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় মহাবিস্ময় এখানে। গোটা পাঁচতলায় আছে শুধু কম্পিউটারের বই। যেদিকে তাকাই তাকে তাকে সাজানো হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের বই। তাকের গায়ে গায়ে ইংরিজিতে লেখা সফটওয়্যারের নাম। কত নতুন নতুন নাম শুনিইনি কোনওদিন। প্রতিটি বই চিনা ভাষায় রচিত। এ কি কম বিস্ময়ের ব্যাপার! কম্পিউটার বিজ্ঞানে চিন কতটা উন্নতি করেছে তার সামান্য আঁচ পেয়েছিলাম শিয়ার বাড়িতে। আজ তার পরিমাপ করতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। বিশ্বলোকের অনেকটাই দেখা হয়েছে। কিন্তু কোনও শহরে পেইচিং বুক বিল্ডিংয়ের সমতুল্য কোনও বইয়ের দোকানের কথা স্মরণ করতে পারছি না, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সেরা দেশগুলোর, সেরা শহরগুলোতেও না। পেইচিংবাসীদের মতো

বইপ্রেমী মানুষও বোধহয় পাওয়া যাবে না অন্য কোনও দেশে। এরা হাতে করে একটা-দুটো বই কেনে না, ট্রলি বোঝাই করে কেনে।

চারটে বাজে। পাঁচতলা থেকে একতলায় নেমে এলাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আজও ছাতা সঙ্গে নেই। অপেক্ষা করতে হল।

বৃষ্টি ধরেছে। পিলপিল করে মানুষ বেরচ্ছে বইয়ের দোকান থেকে, আশপাশের দোকান থেকে, অফিসকাছারি থেকে। বেরচ্ছে তো বেরচ্ছেই, যেন শেষ নেই।

চিড়েভাজা চানাচুর খেতে খেতে চলেছি মেট্রো স্টেশনের দিকে। পথের ধারে বসেছে দু-তিনজন গণৎকার। সামনে নকশা আঁকা কাগজ পাতা। ঠিক যেমন দেখেছিলাম লিউলিচিয়াও নানে। পুলিশ আসছে দেখে সবাই কাগজ গুটিয়ে দুড়দাড় করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশ চলে যেতেই আবার সবাই ফিরে এসে কাগজ বিছিয়ে বসে পড়ল।

মেট্রো ট্রেনে এলাম কুয়াং ছু ফান। বেলা তখনও আছে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম বাজার। এ গলি সে গলি ঘুরতে ঘুরতে পথ গেল গুলিয়ে। কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না। এক পুলিশকে দেখে এগিয়ে গেলাম তার কাছে।

'লিউলিচিয়াও নান কোনদিকে?'

যুবক এগিয়ে আসে আমার কাছে। হাতের ইশারায় ডেকে এগিয়ে যায়। আমি ওর পিছুপিছু চলি।

'এই ডানদিকের পথ ধরে সোজা চলে যান। আর কোনওদিকে বেঁকবেন না।'

'ধন্যবাদ।'

প্রসন্নমুখে চেয়ে থাকে আমার দিকে। যেন আমার উপকার করে ও নিজেই ধন্য হয়েছে। সেই প্রথমদিন, ১৪ জুলাই কুয়াং ছুয়ো রেলস্টেশনে দেখেছিলাম। তারপর পেইচিং রেলস্টেশনে, পশ্চিম পেইচিং রেলস্টেশনে, শিতানের পথে, ওয়াং ফু চিং বাজারে। দেখেছি অনেকবার। ছিপছিপে ঋজু দেহ সৌম্যদর্শন যুবক সব। তরতাজা তারুণ্যের প্রতীক, পথচারীদের সেবায় অতি উৎসাহী।

হেঁটে হেঁটে ফিরলাম লিউলিচিয়াও। কুড়ি মিনিটের পথ।

১০

উলান বাতোর যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটা হয়েছে। কিন্তু যে স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে হবে সে স্টেশনটাকে এখনও চোখে দেখিনি। কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়বে সেটা দেখে নিতে হবে। চিন থেকে যাব মঙ্গোলিয়া। অভিবাসন দপ্তরের সন্ধান চাই।

শরীরচর্চা সেরে প্রাতরাশ করে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম।

২ নম্বর বাসে উঠলাম। ৪৫ মিনিটের পথ। ভাড়া ২ উয়ান। বাস থেকে নেমে সেতুর ওপর দিয়ে যেতে হল স্টেশনে।

পেইচিং রেলস্টেশন। এর আগে দুটো স্টেশন দেখেছি— কুয়াং ঝুয়ো আর পেইচিং পশ্চিম। তার থেকেও এটা অনেক বড়। ভিড় একইরকম। অনেক অনুসন্ধান

করতে করতে ৪২ নম্বর জানলায় এলাম। খুব ভিড়, বেশ ঠেলাঠেলি হচ্ছে। এখানেও ধুতি-পাঞ্জাবির সৌজন্যে লাইনে দাঁড়াতে হল না। জানলায় বসা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উলান বাতেরের ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?'

মেয়েটি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেনি। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল। একটু পরেই এল একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। একই কথা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ছেলেটি বলল, 'বাঁদিক দিয়ে চলে যান, পঞ্চাশ মিটার পথ গেলেই পাবেন ইন্টারন্যাশনাল টিকিট হল। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, পেয়ে যাবেন।'

পঞ্চাশ মিটার পথটা পাঁচবার হাঁটলাম, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল টিকিট হল খুঁজে পেলাম না। একটি মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

'আপনি কী খুঁজছেন?'

তাকে বললাম কী খুঁজছি।

সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু আমাদের এক্ষুনি ট্রেন ধরতে হবে। আমার স্বামী এগিয়ে গেছে। আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। খুব দুঃখিত।

মেয়েটি হনহন করে চলে গেল।

দুই সুকুমার বালক এসে সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে ওদের মা।

'আপনাকে আমরা সাহায্য করতে পারি?'

তোমরা কী করবে বাছা, বড়রাই কিছু করতে পারছে না। কাজটা তো কঠিন কিছু নয়, তবু কেন কেউ পারছে না সেটাই বুঝতে পারছি না। নিতান্তই দুধের শিশু। কত আগ্রহের সঙ্গে এক অসহায় বিদেশিকে সাহায্য করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে।

বললাম,'আমি উলান বাতোর যাব। উলান বাতোর তো চিনের মধ্যে নয়, চিনের বাইরে। তাই বিদেশে যাওয়ার ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে আমি জানতে চাইছি।'

ওরা কী বুঝল কী জানি। দুই ভাইয়ে পরামর্শ করল। তারপর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর বলল, 'চলুন।'

ওরা দু-ভাই সামনে, তার পিছনে আমি। আমার পিছনে ওদের মা। চারজনে মিলে ছুটছি এক জানলা থেকে আরেক জানলা, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে। কখনও স্টেশনের ভেতরে, কখনও বাইরে, কখনও ট্রেন ছাড়ার প্ল্যাটফর্ম নম্বর আর সময়নির্দেশিকা বোর্ডটার দিকে দুই ভাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কিছুই সুবিধে করতে পারছে না। আবার একটু দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে দুই ভাই পরামর্শ করে নিচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা সময় কেটে গেল। শেষপর্যন্ত ওরা হাল ছেড়ে দিল।

মলিন মুখে বলল, 'দুঃখিত, আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না।'

আহা, কী করবে ওরা। স্বদেশ-বিদেশের মধ্যে পার্থক্য বোঝার মতো বয়সও ওদের হয়নি। মায়ের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছে। মাকে দেখে মনে হচ্ছে নিতান্তই সাধারণ গৃহবধূ। এতসব বোঝার মতো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। দুজনের পিঠ চাপড়ে বললাম, 'খুব ভালো ছেলে তোমরা। এমনি করে মানুষের সেবা করো, অসহায়ের বন্ধু হয়ে থেকো চিরকাল।'

ওদের মাকে প্রণাম জানালাম।

'আপনার যাত্রা শুভ হোক', বলে ওরা হাত নেড়ে চলে গেল।

তখনও খুঁজে চলেছি ইন্টারন্যাশনাল টিকেট হল। ছেলেদুটোর কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে ঢুকে পড়লাম একটা ঘরে। ভেতরে গিয়ে মনে হল এটা ভারি মালপত্র জমা রাখার ঘর অথবা পার্সেল ঘর। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতে পারবেন, মঙ্গোলিয়া যাওয়ার ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে?'

জবাব দিল এক যাত্রী যুবক।

'একটু দাঁড়ান, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সে মালপত্র রেখে রসিদ নিয়ে বলল, 'চলুন।'

পাশে একটা গেট। লম্বা লাইন পড়েছে ভেতরে ঢোকার জন্য। লাইনে দাঁড়ালাম দুজনে। গেটের পাশে একটা যন্ত্র বসানো আছে। সকলে তার ওপর মাল চাপিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকছে, তারপর ভেতরে গিয়ে মাল নামিয়ে নিচ্ছে। নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা। বিমানবন্দরে যেমন থাকে। আমার সঙ্গে সবসময়ই থাকে একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। তাতে থাকে পাসপোর্ট, টিকিট, টাকাপয়সা আর লাঞ্চব্যাগ থেকে নেওয়া কিছু রসদ— বিস্কুট, চানাচুর, চিড়েভাজা, বাদামভাজা, চালভাজা। আমি ব্যাগটাকে কখনওই কাঁধ থেকে নামাই না, এখনও নামিয়ে মেশিনের ওপর চাপালাম না। ভেতরে ঢুকলাম। নিরাপত্তাকর্মী আমাকে দেখল, কিছু বলল না।

ভেতরে ঢুকতেই সামনে একটা বৈদ্যুতিন বোর্ড নজরে পড়ল। তাতে তিনরকম লেখা একটার পর একটা জ্বলছে নিভছে— ইন্টারন্যাশনাল টিকেট রুম, ইন্টারন্যাশনাল প্যাসেঞ্জার্স রুম, ভি আই পি হল। কী আশ্চর্য, এই জায়গাটা খুঁজে বের করতে দুটি ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

বৈদ্যুতিন বোর্ডটা যে দেওয়ালে লাগান আছে সেটা একটা হলঘর। খুব বড় আকারের। কিন্তু বসার কোনও ব্যবস্থা নেই। বহু যাত্রী শুয়ে আছে, কেউ কাগজ পেতে, কেউ মাদুর পেতে, কেউ বা কিছু না পেতে মেঝের ওপর। ভি আই পিদের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা দেখছি না। যত বড় হোমড়া-চোমড়া লোক হও না কেন এখানে সবার সঙ্গে বসতে হবে এক আসনে।

হলঘরের বাঁপাশে প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার প্রবেশদ্বার। সেখানে বসার জন্য চেয়ার আছে। বহু যাত্রী বসে আছে। দ্বারে দণ্ডায়মান মহিলা কর্মীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল আমাকে এখানেই আসতে হবে।

ছেলেটি বলল, 'আমি তাহলে যাই?'

'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

হলঘর পার হয়ে ডানদিকে জিনিসপত্র রাখার ঘর, ক্লোক রুম। ছোট-বড় দুরকম মাপের লকার আছে। তালাচাবি লাগানোর ব্যবস্থা বৈদ্যুতিন, সুতরাং খুব নিরাপদ, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আরও একটু এগিয়ে যেতে পাওয়া গেল শৌচালয়। যারা ভেতরে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে জিনিসপত্র থাকলে সব নিয়েই ভেতরে ঢুকছে। আরও একটু যেতে পাওয়া গেল আরও একটা শৌচালয়। এখানে স্নানের ঘরও আছে। জায়গাটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করে বাইরে চলে এলাম। লিউলিচিয়াও নান থেকে

স্টেশন অনেকটা দূরে। খুব সকালে আসতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না। স্টেশনের কাছে হোটেল পাওয়া না গেলে উলান বাতোর যাওয়ার আগের দিন জিনিসপত্র নিয়ে এখানে রাত কাটানো যাবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

এক ভদ্রলোক চলেছেন স্ত্রী আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। আমাকে দেখে বললেন, 'একটু দাঁড়াবেন, আপনার একটা ছবি নেব?'

বেশ তো নিন না। প্যান্টশার্ট পরে এলে কি আমার এত সমাদর হত? মেয়েকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি নিলেন।

স্টেশনের চত্বরে অনেক হোটেলের দালাল ঘোরাঘুরি করছে। একজনকে বললাম, 'স্টেশনের কাছে হোটেল পাওয়া যাবে ২০০ উয়ানের মধ্যে ভাড়ায়?'

ওরা তিন-চারজন জড়ো হয়ে গেল। নিয়ে এল ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে।

উঁহু, ওটি হবে না। পকেট থেকে পয়সা খরচ করে আমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবে। তারপর দু-চারটে হোটেল দেখার পর আমাকে একটা না একটা পছন্দ করতেই হবে। তোমাদের খপ্পরে পড়ছি না বাপু।

বললাম, 'ট্যাক্সিতে কেন, স্টেশন থেকে হাঁটাপথের মধ্যে চাই।'

ওদের চারজনের তিনজন সরে পড়ল। বাকি একজন বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।'

ওর পিছু পিছু চললাম।

চলেছি তো চলেছিই। সে চলার যেন শেষ নেই। যখনই জিজ্ঞেস করি— আর কতদূর, সে বলে, এই তো সামনে। আধঘণ্টা পর এক হোটেলে নিয়ে এল। সেখানকার ভাড়া ২৫০ উয়ান।

বললাম, 'এত দূরে হোটেল নেব না। ফিরে চলো।'

'চলুন তাহলে, বাসে চলে যাই।'

'তুমি চলে যাও বাসে। আমি হেঁটে হেঁটেই যাব।'

পথ চলতে চলতে আলাপ হল দুয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে। নিজেরাই এগিয়ে এসেছে আলাপ করতে। ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে স্টেশনের কাছে এসে পড়লাম।

সামনে একটা পোস্ট অফিস। আরে, কদিন ধরে একটা চিঠি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। পোস্ট করবার সুযোগ আর হয় না। উলান বাতোরে যাওয়ার খবর এখনও জানানো হয়নি পুরভশোরেনকে। পুরভশোরেন উলান বাতোরে এক পর্যটন কোম্পানির দালাল। সে বলেছিল যাওয়ার আগে তাকে জানাতে। মঙ্গোলিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেবে।

ঢুকে পড়ি ভেতরে। 'উলান বাতোর চিঠি পাঠাতে কত টিকিট লাগবে?'

মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটারের বোতাম টেপাটেপি করে বলল, '৫ উয়ান ৯ মাও।'

আমার মনে হল মেয়েটি ঠিক বলছে না। দুদিন আগে পশ্চিম পেইচিং স্টেশন থেকে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়েছি ৫ উয়ান ৫ মাও লেগেছে। কাছের দেশ মঙ্গোলিয়া, সেখানে চিঠি পাঠাতে সমান লাগতে পারে, বেশি লাগবে কেন। চিঠি পোস্ট না করেই চলে এলাম।

অনেক হেঁটে খুব ক্লান্ত। হোটেলে ফিরে এলাম।

ভিভিয়েন কথা দিয়েছিল কমদামের হোটেল ঠিক করে দেবে। কিন্তু দুটোদিন কেটে গেল, ও কিছু করল না। আসবে বলেছিল, আসেনি, ফোনও করেনি। ওর ভরসায় বসে থাকলে চলবে কেন। নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। কাল চেষ্টা করেছিলাম। সুবিধে হয়নি। আজ আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। মনে মনে এইরকম সাব্যস্ত করে আজ সকালেই বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশে।

পথে বাস খারাপ হয়ে গেল। পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হল। ড্রাইভার পরের বাসে সব যাত্রীকে তুলে দিল।

স্টেশনের সামনে প্রচুর হোটেলের দালাল ঘুরে বেড়ায়, কাল দেখেছি। ওরাও কাল আমাকে দেখেছে। বাস থেকে নেমে রাস্তা পারের সেতু পার হয়ে স্টেশনচত্বরে পা রাখতেই ওদের একজন এগিয়ে এল।

'হোটেল চাই?'

'স্টেশনের কাছে হবে?'

'হ্যাঁ হবে।' পকেট থেকে পুস্তিকা বের করে হোটেলসংলগ্ন অঞ্চলের ম্যাপ আর বিভিন্ন হোটেলের ছবি দেখাতে লাগল।

'কোনটা চাই?'

আমি বললাম, 'যে-কোনও একটা হলেই হবে, কিন্তু ভাড়া ২০০ উয়ানের বেশি হবে না।'

'না, স্টেশনের কাছে ২০০ উয়ানে হবে না, ৩৬০ লাগবে।'

ইতিমধ্যে আরও দুয়েকজন দালাল এসে জুটেছে। সবাই মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে চেষ্টা করল, কিন্তু এর থেকে কমে কোনও সন্ধান কেউ দিতে পারল না।

আমি মনে মনে হিসেব কষে দেখলাম লিউলিচিয়াও থেকে স্টেশনে আসতে ট্যাক্সিভাড়া যদি ১০০ উয়ানও দিতে হয় তাতেও ইনতু হোটেলে থাকাই আমার পক্ষে লাভজনক। সিদ্ধান্ত নিলাম— ভিভিয়েন যদি কোনও ব্যবস্থা করে না দেয় তাহলে ওখানেই থেকে যাব। হোটেল সন্ধানের দরকার নেই।

কালকের মতো আজও একজন অনুরোধ করলেন মেয়েকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলবেন। আমিও বাচ্চাটির ফটো নিলাম।

রুটি আর চানাচুর খেতে খেতে চলেছি। স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছি। পথের পাশে একটা বড় বাড়ির ওপর লেখা আছে পেইচিং ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। আরে! সুকেশ এই হোটেলের কথাই তো বলেছিল। পেইচিং ভ্রমণের জন্য পর্যটন কোম্পানির সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে।

ভেতরে ঢুকলাম। ঘরের সন্ধানে নয়, পর্যটন কোম্পানির সন্ধানে। জানি এ পাঁচতারা হোটেল, আমার মতো পর্যটকের জন্য এ হোটেল নয়।

অভ্যর্থনা টেবিলের পাশে ছোট ছোট বোর্ডে বিভিন্ন ভ্রমণসূচির বিবরণ দেওয়া আছে ছাপানো কাগজে। মিং সমাধিক্ষেত্র সহ মহাপ্রাচীর, গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ সহ নিষিদ্ধ নগরী, আরও অনেক। মধ্যাহ্ন ভোজন সহ ভ্রমণের দামও লেখা আছে।

অনেক কম খরচে মহাপ্রাচীর দেখা হয়ে যেত। ইস! যদি দুটোদিন আগে এই সন্ধানটা পেতাম। এখন আর দুঃখ করে লাভ নেই। তিব্বত ঘুরে আসি। তারপর এদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যাবে। আরও তো দেখার বাকি আছে।

৪ নম্বর বাসে চলেছি। ডানদিকের জায়গাটা যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। তিয়ান-আনমেন স্কোয়্যার না! তাই তো। হুড়মুড় করে নেমে পড়ি পরের স্টপেজে।

সামনেই মাও সে তুং স্মৃতিসৌধ, পার্কের উত্তর সীমায় লাল পতাকা উড়ছে পতপত করে। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীর প্রবেশদ্বারের ওপর মাও সে তুংয়ের ছবি। একবার তো সবই দেখেছি। তবু যেন আশ মেটে না। সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে পার্কের মধ্যে চলে আসি। সেদিন সঙ্গে ছিল শিয়া আর পাও। আজ একা। আবার দেখি সব। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি বীর শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভটা, বীরত্বের প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর নিপুণ হাতে। হাত দিয়ে স্পর্শ করি।

আকাশে ঘুড়ি উড়ছে। আগের দিনেও দেখেছি। রংবেরঙয়ের নানানরকম ছবি আঁকা অভিনব চিনের ঘুড়ি। দূর আকাশে প্যাঁচ খেলা নয়, গোঁত খায় না, 'ভোকাট্টা' বলে কেউ ছোটে না। অল্প দূরে মাথার ওপর লেজ লাগানো শান্ত ঘুড়ির লাটাই ধরে বসে থাকা। কিশোর বালক প্রৌঢ় যুবক সবাই আছে এই দলে।

এক মহিলা ঘুড়ি বিক্রি করছিল। হাতে তার বড় ঘুড়ি। ব্যাগ থেকে ছোট্ট ঘুড়ি বের করে আমার সামনে এল। একটা বড় ঘুড়ির সুতোর সঙ্গে এইরকম ছোট্ট ছোট্ট ঘুড়ি অনেকগুলো করে বেঁধে দিয়ে ওড়ায়। দেখতে হয় যেন ছোট ছোট ঘুড়ির মালা উড়ছে।

'একটা দশ উয়ান। নিয়ে যাও দেশে।'

আমি গরজ দেখাই না। সে আমার পিছন ছাড়ে না। দুটো বের করে বলে দশ উয়ান।

আমি চলতেই থাকি। এবার সে চারটে দেখিয়ে বলে দশ উয়ান। তবু পিছু ছাড়ে না। আমি ওকে তাড়াবার জন্য বললাম, দশটা দশ উয়ান। মহিলা হাসে। আমার পিঠে আস্তে করে সোহাগের চাপড় মেরে চলে যায়, রাগ করে না।

দুটি মেয়ে এসে পথ আটকাল।

'আপনার সঙ্গে আমরা একটু ছবি তুলব?'

আমি দাঁড়ালাম। ওরা একজন আমার পাশে দাঁড়াল আর একজন ছবি নিল। আবার আরেকজন এসে আমার পাশে দাঁড়াল অপরজন ছবি নিল।

'তোমরা কী করো?'

'আমরা ইংরিজি ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করছি। এটা আমাদের শেষ সেমিস্টার। এর পর চাকরি করব।'

'বা! খুব ভালো।'

'আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?'

'ভারত।'

'ও...ভারত! ইনতু রেন! আপনার পোশাক খুব ভালো লাগছে।'

আরেকজন বলল, 'চলুন না রেস্টুরেন্টে চা খাই।'

'না মেই মেই (ছোটবোন)। আমি এখন অনেক ছবি তুলব। রোদ চলে গেলে ছবি তোলা হবে না। তোমাকে ধন্যবাদ।'

ওরা মলিন মুখে চলে গেল। পার্কের উত্তরপ্রান্তে এসে লাল নিশানের সামনে দাঁড়ালাম। লোহার শিকল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার বাইরে একজন পুলিশ, তার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। পুলিশ তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছে। নিশ্চয়ই কিছু অপরাধ করেছে। চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এলাম নিষিদ্ধ নগরীর ফটকের সামনে। মাও সে তুংয়ের ছবির দিকে চেয়ে আছি। একটি মেয়ে এসে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। আরেকজন ছবি নিল। এরপর অন্যজন ছবি নিল। ঠিক আগের দুটি মেয়ের মতো। নতুনরকমের পোশাক ছবিতে ধরে রাখতে চায়। মুচকি হেসে চলে যাচ্ছিল। আমি হাতের ইশারায় ডাকলাম।

'পেই হাই পার্ক কতদূর?'

'বেশিদূর নয়, কাছেই। এইদিক দিয়ে গিয়ে ডানদিকে একটা রাস্তা পাবেন। সেটা দিয়ে একদম সোজা চলে যাবেন।'

হাত নাড়তে নাড়তে ওরা চলে গেল। ওদের নির্দেশমতোই হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম পেই হাই পার্ক। আমাদের পাঠ্যবইতে এর কথা বিস্তর পড়েছি। এখানে আছে শ্বেতপাথরের প্যাগোডা পাহাড়। পাহাড়ের নীচে ইয়োং অন মন্দির, ১৬৫১ সালে চিং রাজাদের প্রতিষ্ঠিত। পার্কের ভেতরে আছে খুব বড় সরোবর। সরোবরের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপ, দ্বীপে গোল নগরী (তুয়ান চেং), ৪,৫০০ বর্গমিটার তার আয়তন, ৫ মিটার উঁচু ২৭৬ মিটার লম্বা প্রাচীরে ঘেরা। এই নগরীর মধ্যে আছে শ্বেত জেড রত্নে তৈরি বুদ্ধ।

পেই হাই পার্ক থেকে হাঁটাপথে আসছিলাম। জায়গাটা পুরনোদিনের কিছু স্মৃতি বহন করছে। নতুনের সঙ্গে পুরাতনের মিশ্রণ। সরু সরু গলি। গলির দুপাশে পুরনোকালের ছোট ছোট বাড়ি। বৃদ্ধরা বসে আছেন গলির মুখে, বাড়ির দরজায়। অবাক বিস্ময়ে দেখে আমাকে। নি হাও বলে হাত নাড়ি ওদের দিকে। ঘাড় নেড়ে প্রত্যুত্তর দেয়।

দুই বিদেশি মহিলা চলেছেন পথের অন্য ধার দিয়ে রুশ ভাষায় কথা বলতে বলতে।

'সদ্রাস্তবুইচিয়ে (নমস্কার)।'

'দোব্রোয়ে বেচের (শুভ সন্ধ্যা)। ব্যুই, ইন্ডিস্কি?' (আপনি ভারতীয়?)

'দা (হ্যাঁ)। সদাস বিদানিয়া (আবার দেখা হবে)।'

পরদিন সকালে ছাং থিংথিংকে জিজ্ঞেস করি, 'পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় কত নম্বর বাস যাবে?'

'পেইচিং পশ্চিম স্টেশনে চলে যান। ওখান থেকে পেয়ে যাবেন।'

সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম।

পথ চলতে চলতে স্টেশনের মধ্যেই দেখি এক জায়গায় অনেক মানুষের লাইন। কিছু একটা কিনছে সবাই। লাইনের একেবারে সামনে এসে দেখি দোকানি হাতে

গ্লাভস পরে টেনিস বলের আকারের সাদা রংয়ের কী একটা বস্তু বড় ড্রামের ভেতর থেকে চিমটে দিয়ে তুলে প্যাকেটে ভরে খরিদ্দারদের দিচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম লাইনে।

কিনলাম দুটো। একটার দাম ৫ চিয়াও বা আধ উয়ান, পাতি বাংলায় একটা আধুলি, দুটো ১ উয়ান। এর নাম মনতৌ বা কৌপুলি (স্টিমড ব্রেড)। পুলিপিঠেই বটে। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি বাষ্পে সিদ্ধ করা ঢাউস দুটো গোলা। সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় খাবার। খেতে খেতে চললাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয় শহরের উত্তরপ্রান্তে। একঘণ্টা বাস চলেছে, ভাড়া নিয়েছে ২ উয়ান। আমার সামনের সিটে বসে আছে একটি ছেলে। কন্ডাক্টার মেয়েটি আমাকে বলল, 'আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন তো। সামনের স্টপে এর সঙ্গে নেমে যান। ও আপনাকে দেখিয়ে দেবে।'

বাস থামল এক বিশাল লৌহকপাটের সামনে। ইয়া উঁচু পাঁচিল। ফটকের পাশে মোতায়েন পুলিশ।

ছেলেটি আমায় জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে দেখা করবেন?'

আমি বললাম, 'যে-কোনও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে। অর্থনীতির হলেই ভালো হয়।'

পুলিশ আটকাল। ভাগিয়েই দিচ্ছিল আমাকে। ছেলেটি অনেক ভুজুংভাজুং দিল। শেষমেশ পুলিশ একটু নরম হল, ছেড়ে দিল।

চওড়া রাস্তা। পথের পাশে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। ফাঁকে ফাঁকে ডালপালা মেলে ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহীরুহ। পথের শেষ মাথায় এক অট্টালিকা। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে অনেকটা ওপরে চাতাল পর্যন্ত। চওড়া চাতাল পার হয়ে ইমারতের প্রবেশদ্বার। ছেলেটি বলল, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দপ্তর। একেকটা বিভাগের জন্য একেকটা বড় বড় অট্টালিকা। অনেকগুলো বিভাগ পার হয়ে অর্থনীতি বিভাগে পৌঁছনো গেল।

দোতলায় লম্বা দরদালান। তার তিনদিকে সারি সারি ঘর। মাঝখানে বড় একটা টেবিল। টেবিলের চারপাশে চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপর গোটাকয়েক জলের বোতল। ছেলেটি আমাকে বসতে বলে একটা জলের বোতল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যারকে কী বলব?'

তাই তো, কী বলবে। আমার নামাঙ্কিত চিঠি লেখার কাগজের প্যাড থেকে একটা কাগজ নিয়ে কাগজের মাথায় ছাপানো অংশটা ছিঁড়ে ছেলেটির হাতে দিলাম। ছেলেটি ওটা হাতে নিয়ে একটা ঘরের ভেতরে গেল। মিনিট দুই পরে বেরিয়ে এসে বলল, 'স্যার একটু ব্যস্ত আছেন, আপনাকে বসতে বলেছেন।'

ছেলেটি চলে গেল। মিনিট দশেক পর অধ্যাপক নিজেই আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

অধ্যাপক ডঃ ওয়াং চি ওয়েন, স্ট্যান্ডিং অ্যাসোসিয়েট ডিন অব ফ্যাকাল্টি অব ম্যানেজমেন্ট। ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর একটা কম্পিউটার, দুটি চেয়ার। ঘরের অবশিষ্ট অংশে গোটাকয়েক বইয়ের আলমারি। অধিকাংশই অর্থনীতির বই।

ইংরিজিতে লেখা বই-ই বেশি। কম্পিউটারের পর্দায় লেখাগুলো সব চিনা লিপিতে, যেমন শিয়ার বাড়িতে দেখেছিলাম। পরিচয়পর্ব শেষ হলে ওখান থেকেই আমি শুরু করলাম।

'এই কি-বোর্ডে তো ছাব্বিশ আর ছাব্বিশ বাহান্নটা অক্ষর লেখা যায়। হাজার হাজার চিনা ক্যারেক্টার কীভাবে লেখেন?'

অধ্যাপক ওয়াং বললেন, 'আপনি কি চিনা ভাষা একটুও জানেন?'

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললাম, 'খুব সামান্য জানি। যেটুকু জানি তার জোরে জানি— এ দাবি করা যায় না।'

ওয়াং বললেন, 'আপনার জানা যে-কোনও একটা শব্দের পিনইন (Pinyin = উচ্চারণ অনুসারে ইংরিজি হরফে চিনা শব্দ) লিখুন।'

আমি লিখলাম WO.

'এবার এন্টার কি টিপুন।'

টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা ইংরিজি শব্দ লেখা হল কম্পিউটারের পর্দায়। চিনা ভাষায় একটা শব্দের চাররকম উচ্চারণে চাররকম অর্থ হয়। বেশিও হতে পারে।

'এবার আপনার যে শব্দটা দরকার সেটার ওপর মাউস ক্লিক করুন।'

WO শব্দের পাঁচরকম অর্থ হয়। তার মধ্যে একটা অর্থ হল 'আমি' (I)। I-এর ওপর মাউস ক্লিক করলাম। সঙ্গে সঙ্গে WO শব্দটি চিনা ক্যারেক্টারে লেখা হয়ে গেল। এইভাবে অন্য শব্দগুলোর ওপর মাউস ক্লিক করে অন্য চারটি শব্দের ক্যারেক্টারও লেখা হল।

অধ্যাপক বললেন, 'এবার বুঝতে পারছেন, কীভাবে ২৬টা কি দিয়ে হাজার হাজার ক্যারেক্টার লিখি আমরা?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সব ভাষায় বর্ণমালা আছে, আপনাদের নেই কেন?'

অধ্যাপক ওয়াং বললেন,'পাঁচ হাজার বছর আগে যখন কোনও ভাষায় বর্ণমালা আসেনি, আমাদের দেশের মানুষেরা ছবি এঁকে মনের ভাবপ্রকাশের কৌশল তৈরি করল। একেকটা ছবি এঁকে বোঝানো হত একেকটা কথা। সেই হল আদি চিনা লিপি। তারপর সেই প্রাচীন লিপিগুলিকে ভেঙে ভেঙে সরলীকরণ করে আধুনিক চিনা লিপি তৈরি হয়েছে। আপনি তো কিছু ক্যারেক্টার জানেন। যে-কোনও একটা এখানে লিখুন।'

আমি লিখলাম 'শুই'।

প্রফেসর বললেন, শুই মানে কী, জল। তাই না? এই দেখুন শুইয়ের আদি ক্যারেক্টার ছিল এইরকম। দেখে মনে হচ্ছে না, এটা নদী আর তার দুপাশে এই নদীর পাড়? এখন পুরনো ক্যারেক্টার ভেঙে শুইয়ের আধুনিক রূপ হল যেটা আপনি লিখলেন।

ওয়াং এঁকে এঁকে দেখাচ্ছিলেন।

আমি বললাম, 'এইভাবেই আমাদের শেখানো হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা বেশ কঠিন। পিনইন লেখা তো চালু করেছেন। ক্যারেক্টার তুলে দিয়ে ওটাকেই দেশ জুড়ে বহাল রাখলে ক্ষতি কী। অনেক দেশ রোমান হরফে নিজেদের ভাষা লিখছে।'

ওয়াং স্মিত হেসে বললেন,'এ আমাদের পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য।

তাকে বাতিল করে দিলে আমাদের নিজস্ব কী রইল? এ যে গর্বের বস্তু।'

'সমাজতন্ত্রও তো আপনাদের গর্বের বস্তু। তাকে কি আর টিকিয়ে রাখতে পারছেন? সে তো ভাঙনের মুখে।'

'কোথায় দেখলেন ভাঙন?' ওয়াংয়ের মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হল।

'আজই বাসে বসে বসে দেখছিলাম 'এসো' তেল কোম্পানির দোকান। এটা কি পুঁজিবাদের সঙ্গে সহবাস?'

'ওঃ, এই কথা', ওয়াং খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাকে আমি আরও গোটাকয়েক নাম বলে দিচ্ছি যাদের দোকান পেইচিংয়ে দেখতে পাবেন। নেসেলস, বি এম ডব্লু, ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি, সামস্যাং— এগুলো সবই পুঁজিপতি দেশের বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আমরা তো চাইছি বিদেশিরা আমাদের দেশে লগ্নি করুক।'

জিজ্ঞেস করি, 'এতে জাতীয় পুঁজির সঙ্গে বিদেশি পুঁজির অসম প্রতিযোগিতা হবে না?'

ওয়াং বললেন, 'না, আমরা তা মনে করছি না। এই মূলধন কাজে লাগিয়ে শক্তিসম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা, বেতার সংযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং বেশকিছু পুরনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বিনিময়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাজার পেয়েছে, মুনাফা করেছে। দেশ যখন গরিব, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি যখন দেশে সৃষ্টি করা যাচ্ছে না তখন বিদেশি পুঁজি আনতেই হবে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণের লাগামটা শক্ত হাতে ধরে রাখতে হবে। আপনার শিশুকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি চিরকাল তাকে কোলের মধ্যে বসিয়ে রাখেন, সে শিশু তো কোনওদিন হাঁটতে শিখবে না। তাকে একটু একটু করে ছেড়ে দিলে তবে সে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, নিজে নিজে হাঁটতে শিখবে। আমরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকতে চাই না।'

'আপনারা তাহলে উদার বাণিজ্য, বিশ্বায়নকে সমর্থন করছেন?'

ডঃ ওয়াং সহজ ভাবে বললেন,'সে তো জানেন, অনেক দেরিতে হলেও আমরা উরুগুয়ে গোল টেবিলে বসেছি, গ্যাটচুক্তিতে সই করেছি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) যোগ দিয়েছি ২০০১ সালে। বর্তমানে আমরা আমাদের অর্থনীতি এবং বাণিজ্যনীতির সংস্কারসাধন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মান উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের কাগজি মুদ্রা রেনমিনবি এখন অবাধ পরিবর্তনযোগ্য। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের প্রধান অংশীদার হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংঘ, জাপান, রাশিয়া, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এইসব দেশ।'

'আপনারা তো সংবিধান সংশোধন করে ব্যক্তি সম্পত্তি আর মানবাধিকারের আইনত স্বীকৃতি দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। ঠিক। সেইসঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। আবার শ্রমিকদের বেকার বিমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'

'তাহলে আপনাদের অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি না বলে মিশ্র অর্থনীতি বলা যায়?'

ওয়াং হেসে বললেন, 'বলতে পারেন এ হল উদার সমাজতন্ত্র, চাইনিজ সোশ্যালিজম।'

'আপনার অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন আমার জন্য। তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আজ বিদায় নিচ্ছি।'

অধ্যাপক একটি অর্থনীতির বই আরেকটি নোটবই আমাকে উপহার দিলেন। লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছে। একহাতে ছাতা নিয়ে আরেক হাতে রুটি খেতে খেতে বাস স্টপেজের সন্ধানে চললাম।

৩২৩ নম্বর বাসে উঠে পড়লাম।

বিকেল ৫টা। কাচের দরজা ঠেলে হোটেলের ভেতর পা দিতেই ছাং থিংথিং চেঁচিয়ে উঠল, 'তাড়াতাড়ি আসুন আপনার ফোন।'

ফোন করেছে ভিভিয়েন। সস্তায় থাকার জায়গার নাম-ঠিকানা লিখে নিলাম।

Dong Tan, East Building B4 of Oriental Plaza Building.

পথনির্দেশও ফোনেই বুঝিয়ে দিল। শিতান থেকে মেট্রো ট্রেনে ওয়াং ফু চিং স্টেশনের পর তোং থান।

পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম তোং থানের উদ্দেশে। পেইচিংয়ে মেট্রো ট্রেনের দুটো লাইন। এ'কদিন এক লাইনে চড়েছি। তোং থানে যেতে হবে অন্য লাইনে। দুটো লাইনই নাতিদীর্ঘ। শিতানে গিয়ে অন্য লাইন ধরতে হল। চারটে স্টেশন পরেই তোং থান।

ব্যবস্থা হল ওরিয়েন্টাল ইউথ হোস্টেলে। মাত্র ৮০ উয়ান ভাড়া। ৩১ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত বুক করলাম। অভ্যর্থনা টেবিলের মেয়েটি বলল, 'একত্রিশ তারিখ সন্ধে ৬টার মধ্যে চলে আসবেন। না এলে ঘর থাকবে না।'

আমি বললাম,'আমি কাল লাসা যাব। ৩১ তারিখ ফিরব। প্লেনের ওপর নির্ভর করবে আমি কখন এসে পৌঁছতে পারব।'

মেয়েটি বলল,'দেরি হলে ফোন করে জানাবেন।'

সবগুলি সমস্যার সমাধান হল একে একে। খোশমেজাজে চলেছি উদ্দেশ্যহীনভাবে। মনে হল কেউ যেন খুব ক্ষীণ কণ্ঠে হ্যালো হ্যালো করছে। পিছনে ঘুরে দেখি একটি মেয়ে আমার পিছু পিছু আসছে আর মিটিমিটি হাসছে।

'আমাকে ডাকছ?'

মেয়েটি কাছে এল। 'ইনতু রেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী সুন্দর দেশ। আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো, চলে এসো আমাদের দেশে।'

'কী করে যাব বলুন। সবে তো পড়াশুনা করছি। পাশ করব, চাকরি করব, পয়সা জমাব, তারপর। সে তো কত দূর।' মেয়েটার মুখখানা ম্লান হয়ে যায়।

'কী পড়ো তুমি?'

'আর্ট পড়ি। দেখবেন আমার স্টুডিও? চলুন না, কাছেই আমাদের কলেজ।'

মেয়েটির নাম অ্যান্নে, পেইচিং আর্ট কলেজে পড়ে। কলেজে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর একটা করে নিজস্ব স্টুডিও থাকে। অ্যান্নে ওর স্টুডিওতে নিয়ে গেল। অনেক ছবি এঁকেছে। প্রচুর ছবি।

ছবি দেখা শেষ হতে অ্যান্নে বলল, 'একটা ছবি কিনবেন?'

চিন দেশের শিল্পকলা। শিল্পীর হাত থেকে কিনব। কিনতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু নিয়ে যাওয়াই তো সমস্যা।

বললাম, 'কিছু মনে কোরো না, আমি অনেকগুলো দেশ ঘুরতে ঘুরতে যাব। প্রায় এক মাস পরে দেশে ফিরব।'

অ্যান্নে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

মেট্রো ট্রেনে ফিরে এলাম কোং ছু ফাং। হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পেলাম লিয়ান হুয়া চি পার্ক। ২ উয়ান প্রবেশ দক্ষিণা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হল।

পার্কের ভেতরে একদিকে একটা বড় লেক। নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। লেকের একটা অংশ জুড়ে আছে পদ্মবন। কৃত্রিম পাহাড়, পাহাড়ে ঝরনা, বনাঞ্চল কত কী আছে এখানে। ঘুরে ঘুরে লেকের অপরদিকে গেলাম। সেখানে শিশুদের জন্য আলাদা উদ্যান, মনের মতো খেলার সাজসরঞ্জাম আছে। বড়দের জন্য আছে শরীরচর্চার কতরকম উপকরণ। যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করতে আসে তারা মাসিক বন্দোবস্ত করে নেয়।

বেলায় বেলায় হোটেলে ফিরে এসে কাল তিব্বত যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। সকাল দশটায় উড়ান। এখান থেকে বিমানবন্দরে ট্যাক্সিতে পৌঁছতে সময় লাগবে এক ঘণ্টা, ভাড়া ১০০ উয়ানের বেশি। বিকল্প ব্যবস্থা আছে। তিব্বত পর্যটন অফিস থেকে এয়ারপোর্ট শাটল বাস যায়। ভাড়া ১৬ উয়ান। সময় লাগে ৪৫ মিনিট। দ্বিতীয় ব্যবস্থা সাব্যস্ত করে হোটেলের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে ছাং থিংথিংকে বিদায় জানালাম। ছাতু পিঁয়াজ লঙ্কা চানাচুর দিয়ে নৈশভোজ সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

সকাল তিনটেয় উঠে পাঁচটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে এলাম। অভ্যর্থনা টেবিলে দুটি মেয়ে আছে। চাবি ফেরত দিয়ে ওদের বিদায় জানালাম।

তখনও দিনের আলো ফোটেনি ভালো করে। বাস স্টপেজে যাত্রী অল্পকিছু আছে। বাসের সংখ্যা খুবই কম, অনেক দেরিতে দেরিতে আসছে। সরকারি বেসরকারি দুরকম বাস আছে। বেসরকারি বাসের কন্ডাক্টররা হেঁকে হেঁকে যাত্রী ডাকে, কলকাতার মতো।

একটা মিনিবাস এসে দাঁড়াল।

'কোথায় যাবেন?'

'কোং ছু ফাং।'

'যাবে, চলে আসুন।'

ভাড়া ১ উয়ান। কন্ডাক্টর নিল ২ উয়ান। মালের জন্য ১ উয়ান বেশি। পনেরো মিনিটে পৌঁছে গেলাম কোং ছু ফাং। হাঁটতে হাঁটতে মেট্রো স্টেশন এসে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন পাওয়া গেল। তিব্বত পর্যটন অফিসে পৌঁছলাম ৬টায়। একটি বাস

দাঁড়িয়ে আছে। এখানে পুরুষ কন্ডাক্টর।

'মাল এখানে রেখে টিকিট কিনে নিন। এই বাস এক্ষুনি ছাড়বে।'

পাশেই টিকিটঘর। টিকিট কিনে বাসে উঠলাম।

বাস ছাড়ল ৬টা ১৫ মিনিটে। ৮টার আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছনো গেল। হাতে অনেক উদ্বৃত্ত সময়। একটা ইংরিজি কাগজ কিনলাম— চায়না ডেইলি। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবর— কৃষি শিল্প খনিজে বিদেশি পুঁজি আহ্বান করা যাচ্ছে।

সাড়ে নটা বাজে। দশটায় বিমান উড়বে। এখনও কোনও ঘোষণা নেই। টিভির পর্দায়ও কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনুসন্ধান অফিস থেকে জানা গেল এই বিমানটি বাতিল হয়েছে, ১১টায় বিমান উড়বে, সেটা চাং তু হয়ে যাবে।

চিনের চাং তু বিমানবন্দরে পৌঁছলাম ১২টায়। আবার বোর্ডিং পাস নিতে হল। ৩টেয় বিমান উড়ল।

১১

হিমালয়ের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ঘোষণা হচ্ছে কোন গিরিপথের ওপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। জমাট বরফ ঢাকা পর্বতচূড়াগুলোয় দিনান্তের রোদ এসে রুপোলি সাজে সাজিয়েছে হিমালয়কে। অনেক নীচে নেমে এসেছে বিমান, রুপোলি চূড়াগুলোকে প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে। যেন হিমালয়ের বুকেই নেমে পড়ব আমরা। আবার অনেক ওপরে উঠে এলাম।

লাসা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম বিকেল ৫টায়।

পর্যটন অফিস থেকে বলে দিয়েছিল বিমানবন্দরে অথবা শহরে বাসস্ট্যান্ডে আমাকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক থাকবে। ইতি-উতি তাকিয়ে দেখলাম আমার অপেক্ষায় কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে বাইরে এলাম। বাস দাঁড়িয়ে আছে।

কন্ডাক্টর কিংবা ড্রাইভার কেউ একজন হবে, আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'পারমিট আছে?'

অনুমতিপত্রটা বের করে দেখালাম।

'ঠিক আছে, উঠুন এটায়, ভাড়া লাগবে না।'

তিব্বত অধিত্যকা দিয়ে বাস চলেছে। পথের দুধারে ঝাউগাছ। সামনে ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি ছড়িয়ে দেওয়া যায় পাহাড় ঢেউ খেলে খেলে ধাপে ধাপে উঠে গেছে অনেক ওপরে। যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পথের বাঁহাতে গ্রাম, ডানহাতে একটা ছোট্ট নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে। পাহাড়িপথ বটে, কিন্তু চড়াই-উতরাই নেই। মনে হচ্ছে যেন সমভূমি দিয়েই বাস চলেছে।

ঘণ্টাদেড়েক পর বাস থামল লাসা শহরে। বাস থেকে নামতেই একজন এগিয়ে এল।

'আমার নাম দোরজি, আমি আপনার গাইড, চলুন রিকশায় যাব।'

মিনিট পনেরো পর রিকশা থামল এক হোটেলের সামনে। হোটেলের নাম স্নো

ল্যান্ড। দোরজি বলল, 'আপনি বসুন, আমি দেখে আসি।' একটু পরে ঘুরে এসে বলল, 'এখানে জায়গা নেই। অন্য একটায় যেতে হবে।'

'কেন, জায়গা নেই কেন? তুমি কি ঘর বুক করে রাখোনি?

দোরজি বলল, 'আমাদের তিন-চারটে হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করা থাকে। যেটায় জায়গা হয়।'

জায়গা পাওয়া গেল বানাক শোল হোটেলে। দুবারই আমাকে রিকশাভাড়া দিতে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমায় রিকশাভাড়া দিতে হবে কেন? আমাকে যে বলে দিয়েছে আমার আর কিছু খরচ লাগবে না।'

দোরজি বলল, 'এই রিকশাভাড়াটাই শুধু দেওয়া নেই। আর সব দেওয়া আছে আপনার।'

হোটেলের নাম বানাক শোল। দোতলায় একটা ঘর। ঘরে চারটে খাট। তার তিনটে আগেই দখল হয়ে গেছে, একটা খালি আছে। অতএব ভালোমন্দ বাছাবাছির কোনও সুযোগ নেই। ওটাই আমায় নিতে হবে। চারটে মানুষ ঘুমোতে পারবে সেইরকম ভাবনাচিন্তা করেই ঘর তৈরি হয়েছে। বাড়তি খরচ এতটুকু নেই কোথাও। দু দেওয়াল জুড়ে দুটো দুটো করে চারটে খাট। মাঝখানে দু ফুটমতো চলার পথ। দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা গিয়ে খাটের ওপর বসতে হবে। জিনিসপত্র রাখা তো অনেক পরের ব্যাপার, জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থাও নেই। দেওয়ালে একটা পেরেক লাগিয়েও পয়সার অপচয় করা হয়নি। খুব হিসেবি লোক বাড়ির মালিক। একটা ছোট টেবিল আছে, সেটা অন্য তিন বাসিন্দার জিনিসপত্রে দখল হয়ে আছে। ডিশ রেখে ছাতু মেখে পিঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে নৈশভোজ সারব সেরকম একটু জায়গা নেই। এ কদিন খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। সুটকেস আর লাঞ্চ ব্যাগটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম।

দোতলাজুড়ে এইরকম চারটে ঘর আছে। আরেকটা অতিরিক্ত ঘর আছে মালিকপক্ষের লোকদের থাকার জন্য। পুরুষ, মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক শৌচালয়। তাতে আধা-আব্রুর ব্যবস্থা।

নীচে নেমে এলাম। বেশ বড় পরিসরের হোটেল। চারতলা বাড়ি। চারপাশে ঘর, মাঝখানে উঠান। উঠানে দুটো গাড়ি রাখা আছে। যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য একটা ছোট ঘর আছে। সেখানে পাঁচ-সাতজন বসতে পারে। দেখাশোনার জন্য যারা আছে সবাই মহিলা মনে হল। তাদের থাকার ঘরও এখানে। মনে হচ্ছে এটা এদের পারিবারিক ব্যবসা।

এই ঘরে ঢুকে বোঝা গেল এখানে চিনা ভাষা চলবে না। তিব্বতের ভাষা ভোট।

কর্তৃপক্ষের এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘরে জিনিসপত্র রাখা নিরাপদ তো?'

তিনি বললেন, 'এখানে লকার আছে, নিখরচায়। পাসপোর্ট, টাকাপয়সা রেখে যেতে পারেন।'

লকারের মধ্যে কাঁধের ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। স্নানঘর নীচে কোথায় আছে দেখে নিলাম। দিনের আলো ফোটার আগেই ওটা আমার দরকার হবে।

ঘরে বসে ছাতু মেখে খাওয়া যাবে না বুঝে নিয়েই বাইরে এলাম খাবারের সন্ধানে। দোকানের অভাব নেই, খাদ্যবস্তুও রকমারি আছে। রাতের খাওয়া সেরে ওপরে চলে এলাম।

বেশ রাত হয়েছে। শোওয়ার আয়োজন করছি। ধুতি-পাঞ্জাবি খুলে কোথাও রাখার কোনও জায়গা না পেয়ে আমার পাশে দুটোকে লম্বা করে শুইয়ে দিলাম। ঘরের আর তিন অংশীদার তিনটি খাটের বাসিন্দা তখনও আসেনি। তাদের দেখার সুযোগ হল না। শুয়ে পড়লাম। লেপ একটা আছে কিন্তু লেপ গায়ে দেওয়ার মতো শীত নেই।

অভ্যাসমতো অনেক সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। যথেষ্ট অন্ধকার তখন। অন্য তিনটে খাটে তিনজন ঘুমোচ্ছে। কখন তারা এসেছে টের পাইনি। বাইরে থেকে একটু ঘুরে এসে দেখি তিনজনের একজন খাটের ওপর বসে আছে। সে একটি মেয়ে। 'গুড মর্নিং' বলে আবার সে শুয়ে পড়ল। তিনজনেই বোধহয় একই দলের হবে।

নীচে স্নানঘরে এসে দেখি অভিনব ব্যবস্থা। গণ-স্নানঘর। আব্রুহীন। পাঁচটা শাওয়ার, ঠান্ডা জল, গরম জল, দুরকমই আছে। দেওয়ালে পেরেক পোঁতা আছে। পেরেকে জামাকাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে মুক্ত দেহে, মুক্ত মনে দাঁড়িয়ে পড়ুন যে-কোনও একটা শাওয়ারের তলায়।

এ ব্যবস্থা আমার কাছে একেবারে নতুন নয়। মনে পড়ছে ডেনমার্কে কোপেনহেগেনের গেস্টহাউসের কথা। স্নানঘরে না জেনে ঢুকে পড়ে এমন চমক লেগেছিল যে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। পাঁচ-সাতজন লোক একেবারে দিগম্বর হয়ে দিব্বি স্নান করছে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে। ফাঁকা হওয়ার অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করে রইলাম। যারা আছে তারা কাজ সেরে চলে যাচ্ছে আবার নতুন লোক এসে ঢুকছে। সুযোগ আর আসে না। যস্মিন দেশে যদাচার। সবাই পারছে আমি কেন পারব না? উদ্যম নিলাম একবার। কিন্তু চেষ্টা করেও লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে পারা গেল না। পা সরল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সুযোগ পেলাম। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে স্নান সেরেছিলাম। এখানে একটা সুবিধে আছে, এখনও কারও ঘুম ভাঙেনি। আমি একাই আছি। কিন্তু তাই বলে দরজা বন্ধ না করে? ওটি কিছুতেই হয়ে উঠবে না। দরজা বন্ধ করে চটপট স্নান সেরে নিলাম।

৬টা বেজে ১৫ মিনিট হয়েছে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। শরীর চর্চার জায়গা নেই ঘরে। লাঞ্চ ব্যাগ থেকে চিড়ে ভাজা আর চাল ভাজা বের করে অন্ধকারে খাটের ওপরেই প্রাতরাশে বসে গেলাম। আলো জ্বালিনি, পাছে ওদের ঘুম ভেঙে যায়।

সাড়ে সাতটায় সকালের আলো ফুটল। শীত একেবারেই নেই।

কাল দোরজি বলে গেছে ৯টায় তৈরি থাকতে। দলাই লামার গ্রীষ্মাবাসে যাওয়া হবে। আমি ৮টাতেই নেমে এলাম। পাটভাঙা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরেছি। কাশ্মীরি শালটা পাট করে কাঁধের ওপরে ঝুলিয়ে দিয়ে বরযাত্রী সেজেছি। যতই হোক রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি তো। পায়ে শুধু নাগরাইয়ের বদলে কাবলি জুতো।

কাল রাতে একবার এসেছিলাম বাইরে খাবারের সন্ধানে। তখন ভালো করে বোঝা যায়নি ছোটবেলায় স্বপ্নে দেখা আরও একটা দেশে এসে পড়েছি। সেই যে মনে

পড়ে ভূগোল বইতে পড়তাম— তিব্বতের মালভূমিকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়।

সেই স্বপ্নের রাজ্যে আজ দাঁড়িয়ে আছি। পৃথিবীর ছাদ এখন আমার পায়ের তলায়। এর আরেকটা নাম আছে— ভূপৃষ্ঠের তৃতীয় মেরু। কত বড় আকাশ, কী ঘন নীল। এত বড় আকাশ, এত নীল তার রং হয় জানিই না। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়চূড়াগুলো রহস্যময়ী। এমনই রহস্যময়ী ছিল গোটা দেশটা বিশ্ববাসীর কাছে। মাত্র সেদিন, ১৯৮০ সাল থেকে তিব্বতের দরজা খুলে গেছে, পর্যটকরা আসতে শুরু করেছে।

প্রকৃতির বর্ণাঢ্য সাজে রূপসী তিব্বতের রূপের সীমা নেই। পৃথিবীর সবথেকে উঁচু পর্বতচূড়া মাউন্ট এভারেস্ট (চিনা নাম কোমোলাঙমা) আকাশের সাম্রাজ্যকে ফুটো করে ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৮ ফুট) ওপরে উঠে গেছে। কত শত পাহাড়চূড়া, ৫,০০০ মিটারের থেকেও বেশি উঁচু, সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেকং, ইরাবতী নদী শুরু হয়েছে এখান থেকে। স্বচ্ছ জলের সরোবর মানস সরোবর, আরও হাজার দেড়েকের বেশি সরোবর আছে এই মালভূমির ওপর।

চিনের স্বয়ংশাসিত অঞ্চল তিব্বতের রাজধানী লাসা। পৌরাণিক গাথায় বলে এক বৌদ্ধমঠ তৈরির জন্য একটা ডোবাপুকুর মাটি দিয়ে ভরাট করতে ভেড়া নিযুক্ত করা হয়েছিল। ভোট ভাষায় 'রা' মানে ভেড়া আর 'সা' মানে ডোবা। তার থেকে জায়গাটার নাম হয়ে গেল 'রাসা'। পরে নতুন নামকরণ হয়েছে 'লাসা', যার অর্থ 'পবিত্র ভূমি'।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে তিব্বত শাসন করে আসছে যে রাজবংশ তারা ছিল গে-লুকস-পা সম্প্রদায়ের লোক। এরা বংশপরম্পরায় রাজ্য শাসক এবং বৌদ্ধ শিরোমণি, তাই লামা। ষোড়শ শতাব্দীতে বংশের তৃতীয় রাজা মঙ্গোল দেশে গিয়ে মঙ্গোলরাজের কাছ থেকে 'দলাই' উপাধি পেলেন, যার মানে হল সাগর— সাগরের মতো বিশাল যার হৃদয়। সেই থেকে এই রাজবংশ দলাই লামা নামে পরিচিত। এদের প্রকৃত নাম কেউ জানে না, দলাই লামা ১ম, দলাই লামা ২য়, এমনই এদের পরিচয়, যেমন ইংরেজ রাজাদের নাম থাকত জর্জ ১ম, জর্জ ২য় ইত্যাদি। চতুর্দশ দলাই লামা, যাঁর প্রকৃত নাম উচ্চারণ করতে পারছি না, তাই রোমান হরফে লিখে দিলাম, Bstandzin-rgya-mtsho লামা রাজবংশের শেষ রাজা। ১৯৪০ সালে সিংহাসনে বসেছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিব্বতের ওপর চিনের শাসন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ভারতে পালিয়ে আসেন। সেই থেকেই তাঁর নির্বাসিত জীবন চলছে আমাদের দেশে।

এই দলাই লামার গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নরবুলিংকা দেখতে যাব।

দোরজি এল নটার একটু পরে। দুটো ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল হোটেলের সামনে। দোরজিকে দেখে আরও কয়েকজন বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। দলে আমরা পাঁচজন হলাম। আমি একটা গাড়িতে উঠলাম। আমার সঙ্গে আরেকটি যুবক উঠল। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে এসেছে। এম এসসি ক্লাসে রসায়নের ছাত্র। দলের আর তিনজন একটি পরিবার, বাবা, মা আর মেয়ে মঙ্গোলিয়া থেকে এসেছে। ওরা তিনজন একটা ট্যাক্সিতে উঠল। দোরজি উঠল আমাদেরটায়।

গাড়ি থামল নরবুলিংকা রাজপ্রাসাদের সামনে। ৬০ উয়ান প্রবেশদক্ষিণা দিয়ে প্রাসাদের ভেতর ঢুকলাম। দলাই লামাদের রাজপ্রাসাদ। এক মহল থেকে আরেক মহল দেখতে দেখতে চলেছি। বসার মহল, খাওয়ার মহল, বুদ্ধমন্দিরের জন্য মহল। সবথেকে ভালো লাগল রাজার গ্রন্থাগারটি। অনেক প্রাচীন পুঁথি যত্নে রাখা আছে। সব সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথি। রাজা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত চল্লিশ বছরের বেশি হয়ে গেছে। তবু প্রাচীন ঐশ্বর্যের ছিটে-ফোঁটা যা এখনও রয়ে গেছে তা দেখে বোঝা যায় প্রাসাদের নাম নরবুলিংকা সার্থক হয়েছে, যার অর্থ হল রত্নখচিত প্রাসাদ। এই বিশাল ঐশ্বর্য বৈভব ভোগবিলাসের ত্যাগ স্বীকার করে চতুর্দশ দলাই লামা স্বাধীন তিব্বতের স্বপ্ন দেখছেন এখনও, বিপুল জনমত গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এখন এই রাজপ্রাসাদ জনগণের প্রমোদ উদ্যান।

রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলাম। দোরজি বলল আজকের ভ্রমণসূচিতে এই একটাই আছে, কাল আবার সকাল ৯টায় তৈরি থাকতে হবে। কাল দুবেলা ভ্রমণ। ইংরেজ ছেলেটি চলে গেল একদিকে। মঙ্গোল পরিবার চলে গেল অন্যদিকে। আমি ফিরে এলাম হোটেলে। শালটা খাটের ওপর রেখে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে চলেছি। পথ খুব প্রশস্ত নয়, যানবাহনের জটলা নেই। মাঝে মাঝে দুটি একটি বাস যাচ্ছে। যাত্রীর ভিড় কম।

পথে জনতার ভিড়। চেহারায় দৈন্য প্রকাশমান, কিন্তু মুখমণ্ডলে লেশমাত্র মালিন্য নেই। হাসিমুখে দৈন্যকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছে এরা। চলমান সকলেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে আমাকে। সে দৃষ্টিতে বিস্ময় নেই, আছে সম্প্রীতির স্পর্শ। মিষ্টি হেসে কেউ বলে 'ইন্ডিয়া', কেউ বলে 'হিন্দুস্তান', কেউ বা পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে 'দলাই লামা', বুঝিয়ে দেয়— আমি এদের কাছে অচিন দেশের মানুষ নই, আমার ধুতি-পাঞ্জাবি এদের কাছে বিস্ময় নয়। এরা জানে ভারত-তিব্বতের প্রাচীন সখ্যের কথা। একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধশ্রমণ অতীশ-দীপঙ্কর নালন্দা থেকে তিব্বতে এসেছিলেন, অনেক বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের সংস্কারসাধন করেছিলেন। এখানেই তিনি শেষজীবন কাটিয়ে গেছেন। এসব এরা জানে। এরা জানে তিব্বতে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হলে বহু তিব্বতবাসী উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এদের প্রিয় দলাই লামা এখনও ভারতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন, তাও এদের অজানা নয়।

ধীর পায়ে চলেছি ফুটপাত দিয়ে। কত ছেলেমেয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। হাতজোড় করে কেউ বলছে, নমস্তে, কেউ বলছে, পরণাম। হিন্দিতে আলাপ করছে। ধরমশালা, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ এদের অনেকের কাছে খুব পরিচিত।

লাসার সবথেকে বড় বাজার পারচোর। একটি মেয়ে সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। নমস্তে, বলে হিন্দিতে আলাপ শুরু করল। নাম ডিকি। বাজারের মধ্যদিয়ে চলেছি। ডিকি আমার পাশে পাশে চলেছে কথা বলতে বলতে। অনূর্ধ্ব কুড়ি বছরের, ছোটখাটো চেহারার মেয়ে। পরিষ্কার হিন্দিতে কথা বলছে। কত কথা বলছে, ধরমশালায়, দিল্লিতে কেমন কাটিয়েছে সেকথা, তিব্বতের কথা, ওর কথা, দিল্লি

থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এসেছে, এখন চিনা ভাষা শিখছে, এরপর চাকরির চেষ্টা করবে। বলল ওর ঘরের কথা, ওর বাবা নেই, মা অল্প কিছু রোজগার করে সংসার চালায়, ওর পড়ার খরচ চালায়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি চিনা?'

বলল, 'না, আমরা তিব্বতি।'

এ শুধু ডিকির কথা নয়, যারা যারা আলাপ করতে এসেছে সবাইকে একই প্রশ্ন করেছি। সবাই একই জবাব দিয়েছে। আমার পরিচয় কেউ জানতে চাইলে আমি বলি ভারতীয়, বাঙালি বলি না কখনও। এরা কেন নিজেদের চিনা বলে না, তিব্বতি বলে পরিচয় দেয়, সে প্রশ্ন করিনি কাউকে।

অনেক বড় বাজার। সবরকম জিনিস আছে। শাক-সবজি, মাছ-মাংস, চাল-ডাল, মশলাপাতি, জামাকাপড়, বাসনপত্র, গয়নাগাটি, সাজগোজ, মণ্ডা-মিঠাই। কিছুই বাদ নেই। মাংসের দোকানে ইয়া বড় বড় জন্তুর দেহ ঝুলছে। ইয়াক হবে। চাল-ডালের বাজারে দেখলাম বস্তা বস্তা মুড়ি। বাংলার বাইরে মুড়ি! অতিশয় আশ্চর্যের ব্যাপার, এই প্রথম দেখছি।

'চলুন না, আমাদের বাড়ি।' ডিকি আবদারের সুরে বলে।

'কোথায় তোমাদের বাড়ি?' জিজ্ঞেস করি।

'এই তো এই বাজারটার পরেই। খুব কাছে।'

এমন প্রাণের আবদারকে পায়ে ঠেলে দিই কী করে। গেলাম ওর সঙ্গে। অনেক পুরনোকালের এক দোতলা বাড়ির দোতলায় একটা ছোট্ট ঘরে ওদের তিনজনের সংসার— ও, ওর মা আর একটা কুকুর। অনেক গল্প হল।

এখন ফিরতে হবে। ডিকি আমার সঙ্গ ছাড়ে না। পথ চলতে চলতে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ছাতা আছে। মুষলধারে বৃষ্টি ছাতা দিয়ে ঠেকানো যাচ্ছে না। এই বৃষ্টির মধ্যে মেয়েটাকে ছেড়ে দিই কী করে। দুজনেই ছাতার নীচে আঁটোসাঁটো হয়ে চললাম। দুজনেই আধাভেজা হলাম। এখন পাহাড়ি দেশের শীত একটু অনুভব করছি। মনে হচ্ছে শালটা সঙ্গে থাকলে ভালোই হত।

হোটেলে ফিরে এসে ছাতাটা ডিকিকে দিয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে জামা ছেড়ে ফেলো। ঠান্ডা লেগে না যায়। কাল সকালে ছাতাটা দিয়ে যেও।'

ডিকি বলল, 'কাল সকালে আমার কম্পিউটার ক্লাস আছে, বিকেলে আসব।'

'ঠিক আছে। চলে যাও তাড়াতাড়ি।'

বিকেলের মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়লাম আবার একা একা।

হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম জোংকার মন্দির। তিব্বতের সবথেকে বড় মন্দির। কী ভিড়! কিছু বিদেশি পর্যটক দেখা যাচ্ছে। ওরা এগিয়ে এসে আমার ছবি নিল। আমিও নিলাম ওদের। মন্দিরের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে শান বাঁধানো প্রাঙ্গণ। সেখানে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। পথের দুধারে সারি সারি দোকান। ধম্মকম্ম করবার জিনিসের দোকান যেমন আছে, তেমনই আছে খাবারের দোকান। তেলে ভাজা হচ্ছে আলু, মাংস আরও কত কী! রসনাতুর খরিদ্দাররা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, কড়া থেকে নামার অপেক্ষায়। একেবারে কলকাতার পথের দৃশ্য। লম্বা কাঠিতে চারটে

করে ছোট ছোট গোল আলু গেঁথে তেলে ভেজে কাঠিসুদ্ধ বিক্রি হচ্ছে। একটা কাঠি এক উয়ান।

পথের দুধার দেখতে দেখতে চলেছি। মেয়ে দোকানিরা ডাকে, কিছু কেনো। শিশু ভিখিরির দল ঘিরে ধরে। ওদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। পিছু ধাওয়া করে। ছোট ছোট মেয়েগুলো সামনে এসে হাতজোড় করে পথ আটকায়, জামা টেনে ধরে। এ শহরের মোট জনসংখ্যা ৪০,০০০, তার মধ্যে ৪,০০০ নাকি ভিখিরি।

আটটা বাজে। তখনও বেশ রোদ আছে। ফিরে চলেছি হোটেলের দিকে। ফলের দোকান পেয়ে দুটো আপেল কিনলাম। আপেল কেনা উপলক্ষ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য দাঁড়িপাল্লাটা দেখা। একটু অভিনবত্ব আছে। দাঁড়ির সঙ্গে একদিকে পাল্লা আছে। সেইদিকে মাল বসানো হয়। অপরদিকে পাল্লা নেই। বাটখারাটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় দাঁড়ির অপর প্রান্তে।

পথের ধারে আলু ভাজা, মাংস ভাজা হচ্ছে। তিন বিদেশি দোকানিকে ঘিরে বসে আছে টুলের ওপর। একজন মন্তব্য করল, 'ভারতীয়।' দাঁড়িয়ে পড়লাম। তিনজনেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। একজন একটা টুল এগিয়ে দিল। বসলাম।

'কী করে বুঝলেন আমি ভারতীয়?'

ওদের একজন বলল, 'এ পোশাক ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই।'

'আপনারা কোন দেশের?'

তিনজনে হাজিরা খাতায় নাম তোলার মতো একে একে হাত তুলে তুলে বলল, 'অস্ট্রেলিয়া', 'ফ্রান্স', 'ইজরায়েল'।

কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিন দেশের তিনজন একজায়গায় হলেন কী করে?'

ইজরায়েলি যুবক চটপট জবাব দিল, 'ঠিক যেমন করে এখন চার দেশের চারজন এক জায়গায় হয়েছি।'

চারজনেই হেসে উঠলাম। ২০০১ সালে কীভাবে ভিসা ছাড়াই সস্ত্রীক জেরুজালেম থেকে প্যালেস্টাইনে ঢুকে পড়েছিলাম, আবার কীভাবে বেরিয়ে এসেছিলাম সে গল্প শোনালাম ওদের।

ইজরায়েলি যুবক বলল, 'ধরা পড়লে আজ আপনাকে এখানে পেতাম না। আমাদের দেশের জেলখানায় আপনাকে দেখা যেত।'

কড়াইতে মাংস ভাজা হচ্ছে। ফরাসি যুবকের সবুর সইছিল না। ভাজা রাখার গামলা থেকে চারটে ভাজা আলু গাঁথা একটা শলাকা তুলে নিয়ে আমার সামনে ধরল। আমি একটা তুলে নিলাম। তারপর ওরা তিনজন তিনটে তুলে নিল।

ইতিমধ্যে দোকানি কড়া থেকে চারটে মুরগির ঠ্যাং নামিয়ে চারটে ডিশে দিয়েছে। একেকটা ঠ্যাং তিন উয়ান। বেশ সস্তা।

একটা কামড় দিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কী করলাম, পেইচিং স্টেশনে ডিম ফেলে দিলাম, আর এখানে ঠ্যাং খাচ্ছি। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। নেওয়ার আগে মনে পড়লে বলতে পারতাম, খাই না। এখন তা বলা চলবে না, ফেলেও

দেওয়া যাবে না। খেতে খেতে বললাম, 'সার্সের ভয় নেই তো?'

ফরাসি যুবক বলল, 'আমরা তো খেয়ে যাচ্ছি।'

রাতের খাওয়া সেরেই হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সকালে আমরা পাঁচজন অপেক্ষা করছি। যাওয়া হবে সেরা মনাস্ট্রি। ৯টাতে দোরজি এসে গেল। হেঁটে হেঁটে যাওয়া হল, হোটেলের কাছেই মনাস্ট্রি। ৫৫ উয়ান প্রবেশ-দক্ষিণা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হল।

বড় বুদ্ধের মন্দির। ঘরে ঘরে বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির সামনে একটা করে বড় গামলায় জমাট বাঁধা মোম। তার পাশে মোমবাতি জ্বলছে। একটা বড় প্রণামীর বাক্স আছে। দেওয়ালে পেরেকে ঝুলছে সরু সরু লম্বা সিল্কের কাপড়ের টুকরো। দেখতে যেন রংবেরঙের মাফলার। দর্শনার্থীদের খুব ভিড়। লাইন লেগেছে। সকলে জ্বালানো মোমবাতি থেকে একটু করে তরল মোম নিয়ে গামলায় ঢেলে দিচ্ছে। কেউ কেউ এক টুকরো সিল্কের কাপড় নিয়ে বুদ্ধের গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে। সবাই দিলে লাসার বাজারে সিল্কের কাপড়ের ঘাটতি পড়ে যেত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

এরপর সবাই প্রণামীর বাক্সে প্রণামী দিচ্ছে। খুচরো পয়সা না, নোট, ১ উয়ান, ৫ উয়ান, ১০ উয়ান, ৫০ উয়ান, ১০০ উয়ানের নোট ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। কিছু নোট বাক্সের মধ্যে পড়ছে, কিছু বাক্সের বাইরে পড়ছে, কিছু বাক্স পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না, পথের ওপর পড়ছে, চলমান দর্শনার্থীদের পদতলে পিষ্ট হচ্ছে। দর্শনার্থীরা কেউ দয়া করে নোটগুলো তুলে বাক্সে দিয়ে দিচ্ছে না। যতগুলো ঘরে বুদ্ধমূর্তি আছে সব ঘরেই একই দৃশ্য।

ছবি তুলতে যেতেই লামারা আপত্তি করল। ছবি তুলতে হলে ১০ উয়ান দিতে হবে। এত নোট মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে সব ঘরে, তবুও? ছবি না তুলেই চলে এলাম।

আজ দুবেলা ভ্রমণ। দোরজি বলল, 'দুপুরে আমরা যাব পোতালা প্যালেস। আপনারা খাওয়াদাওয়া সেরে নিন। দুটোর সময় হোটেলের সামনে থাকবেন।'

এখানে আমাদের দল ভাগ হয়ে গেল। মঙ্গোল পরিবার চলে গেল অন্যদিকে। ইংরেজ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

ও যাবে এয়ার চায়না অফিসে টিকিট কাটতে। কাল ও চলে যাবে। আমি ওর সঙ্গে বাসে উঠে পড়লাম। আমিও কাল চলে যাচ্ছি। কাল বিকেল ৬টার মধ্যে ইউথ হোস্টেলে পৌঁছতে হবে, ওরা বলে দিয়েছে। কিন্তু আমি যাচ্ছি চাং তু হয়ে। চাং তু বিমানবন্দরে দুঘণ্টা বসে থাকতে হবে। কাজেই পেইচিং সময়মতো পৌঁছতে পারব কিনা সন্দেহ হচ্ছে। যদি সরাসরি লাসা থেকে পেইচিং বিমানে সিট খালি পাওয়া যায় সেই সন্ধানে গেলাম বিমান অফিসে। সন্ধান নিয়ে জানলাম লাসা-পেইচিং বিমানে কাল কোনও জায়গা খালি নেই।

এখানে দেখা হয়ে গেল মঙ্গোল পরিবারের সঙ্গে।

'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?' মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

মেয়েটি বলল, 'বাবা চলে গেলেন, বাবাকে বাসে তুলে দিলাম।'

'তোমরা কবে যাবে?'

আমরা আরও তিনদিন এখানে আছি। তারপর যাব।'

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি হোটেলের দিকে। মেয়েটির নাম হুলান। নিউইয়র্কে থেকে পড়াশোনা করত। মঙ্গোলিয়ায় উলানবাতোর শহরে থাকে।

আমি বললাম, 'আমি তো উলানবাতোর যাব।'

'তাই নাকি! কবে যাবেন?'

'আগস্ট মাসের আট তারিখ।'

'আমি আমার ফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে গিয়ে ফোন করবেন। আমি চলে আসব। আপনাকে নিয়ে যাব।'

হুলান ফোন নম্বর লিখে দিল। আমি আমার ই-মেল ঠিকানা ওকে লিখে দিলাম।

হোটেলে পৌঁছে আমি ঘরে চলে এলাম, হুলান আর ওর মা গেল বাজারে খাবার কিনতে। খাওয়া সেরে নীচে নেমে এলাম ১টা ৪০ মিনিটে।

বেলা দুটোয় দোরজি দুটো ট্যাক্সি নিয়ে এল। এখন যাওয়া হবে পোতালা রাজপ্রাসাদ।

দলাই লামাদের শৈতাবাস-প্রাসাদ পোতালা রাজপ্রাসাদ। পাহাড়ের চূড়ায়। পথ আধাগোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে উঠতে হচ্ছিল। প্রবেশদক্ষিণা ১০০ উয়ান।

পাহাড়ের চূড়ায় স্বল্প পরিসর জায়গায় রাজপ্রাসাদ। খাড়াই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলায় ওঠা বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তার ওপর দর্শনার্থীদের ভিড়। মস্ত লম্বা লাইন লেগেছে। সেই লাইন ঠেলে যাওয়া আরও কঠিন কাজ। দোরজি আমাদের লাইন কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে চলল এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, একতলা থেকে দোতলায়।

ঘরে ঘরে বুদ্ধের মূর্তি। কিছু অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব মূর্তি আছে— সাদা বুদ্ধ, কালো বুদ্ধ, লাল বুদ্ধ, হলুদ বুদ্ধ। সাদা বুদ্ধ সাতনয়নী নারীমূর্তি। একেকরকম রঙের বুদ্ধের একেকরকম অর্থ আছে। এই দরিদ্র দেশের মানুষেরা হাজার বছর আগে এত কল্পনাবিলাসী ছিল! ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অথবা অতীশ-দীপঙ্করের কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এইসব মূর্তিগুলো? কী এদের অর্থ? মন্দিরের লামারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। দোরজিও ভালো জানে না। মন্দিরের আর সব ব্যবস্থা সেরা মনাস্ট্রির মতোই। মোমবাতি, সিল্কের কাপড়, প্রণামীর বাক্স, বাক্স উপচে পড়া নোট দর্শনার্থীদের পদদলিত হওয়া, সব একরকম।

পোতালা রাজপ্রাসাদের একেবারে ওপরে ছাদে চলে এলাম। এখানে দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য একটা ঘর আছে। ছোট্ট একটা দোকান আছে। রাজপ্রাসাদে তৈরি কিছু হস্তশিল্পদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে দোকানে। ছাদের খোলা জায়গায় একটা পাথরের নারীমূর্তি আছে। দোকানিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম এটি রানি ওয়েন চেঙের মূর্তি। তিব্বতিদের সঙ্গে চিনের হান সম্প্রদায়ের সখ্য গড়ে উঠেছিল সপ্তম শতাব্দী থেকে। তিব্বতের রাজা চিনের রাজকুমারী ওয়েন চেঙের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তিব্বতের রানি করে নিয়ে এসেছিলেন। তেরোজন দলাই লামার মূর্তি আছে তেরোটা ঘরে। চতুর্দশ দলাই লামা তো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে স্বনির্বাসনে আছেন ভারতে। তাঁর মূর্তি

আর কী করে থাকবে।

দুঘণ্টায় রাজপ্রাসাদ দর্শন শেষ হল। দোরজির কর্তব্য শেষ। সে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার মতো চললাম। আমি হোটেলে ফিরে এলাম। ডিকি আমার অপেক্ষায় এসে বসে থাকবে।

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অনেকে এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে হাতজোড় করে।

'নমস্তে।'

সবাই কমবয়সের ছেলেমেয়ে। একটু পরে ডিকি এল ছাতা নিয়ে। ঘরে বসে ওর সঙ্গে গল্প করে কেটে গেল বিকেলটা। কালকের কেনা আপেল একটা এখনও আছে, ওকে দিয়ে দিলাম।

ডিকি চলে গেল। বসার ঘরে গিয়ে পেইচিং ইউথ হোস্টেলে ফোন করে জানালাম, লাসা থেকে বলছি, কাল আমার পৌঁছতে দেরি হতে পারে। ওরা বলল, ঠিক আছে।

পরদিন সকাল আটটায় বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। এয়ার চায়না অফিসে এসে আরেকবার চেষ্টা করে দেখলাম, সরাসরি পেইচিংয়ের বিমানে যাওয়া যায় কিনা। অফিসের মেয়েটি বলল, 'তাতে আপনার লাভ নেই। সরাসরি যে বিমান সেটা পেইচিং পৌঁছবে রাত দশটায়, চাং তু হয়ে যেটা যাবে সেটা আগে পৌঁছবে।'

মেয়েটি একটু থেমে বলল, 'আপনি তাড়াতাড়ি যেতে চান, এক্ষুনি একটা চাং তু ফ্লাইট আছে। চাং তুতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পেইচিং ফ্লাইট পেয়ে যাবেন। যেতে চান তো চলে আসুন আমার সঙ্গে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

চললাম ওর সঙ্গে। মেয়েটি ছুটছে, আমিও ছুটছি ওর পিছন পিছন। চেক ইন কাউন্টারে এসে আমার পাসপোর্ট আর টিকিট নিয়ে নিজেই কাউন্টারে দিয়ে বলল, 'চট করে এটা করে দাও তো।' সুটকেস আর ব্যাগ চাপিয়ে দিলাম ওজন যন্ত্রের ওপর। দু-মিনিটে কাজ হয়ে গেল।

বোর্ডিং পাস নিয়ে আবার ছুটেছি ওর পিছন পিছন। যেখানে বিমানবন্দরের শুল্ক দিতে হয় সেখানে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি ৫০ উয়ান বের করে দিন।'

টাকা পকেটেই ছিল। দিলাম বের করে। রসিদ নিয়ে আবার ছুটেছি। গেটের সামনে এসে বলল, 'ছুটে চলে যান। আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি পিয়ারের মধ্যদিয়ে। প্লেনের ভেতর ঢুকে বোর্ডিং পাসটা দেখাতে বিমানকর্মী মেয়েটি আসন দেখিয়ে দিল। আসনে বসেছি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়োজাহাজ নড়ে উঠল।

চাং তুতে পৌঁছে দেখি পেইচিং বিমানের চেক ইন চলছে। ১টা ২০ মিনিটে বিমান উড়বে। হাতে মাত্র ২০ মিনিট সময়। বিমানকর্মীরা ব্যবস্থা করে দিল ছুটোছুটি করে। কী সেবাপরায়ণ মেয়েগুলো! শরীরে ক্লান্তি নেই, মুখ সদাহাস্যময়। আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, যেন আমার থেকে ওদের গরজ বেশি। একজন বিদেশির জন্য এতটা শ্রম, এত সময় ব্যয়, এত আন্তরিকতা। না, পাইনি কোথাও। হলফ করে বলতে পারি অন্য কোনও দেশের কোনও বিমানবন্দরে পাইনি এখনও পর্যন্ত।

পেইচিং বিমানবন্দরে নামলাম বিকেল চারটেয়।

১২

ইউথ হোস্টেলে পৌঁছলাম ঠিক ৬টায়। ৮০ উয়ান করে ৬ দিনের ঘরভাড়া আর জমা ১২০ উয়ান দিয়ে লিফটে উঠলাম। এরা চাবি দেয় না, ঘরের নম্বর লেখা একটা কার্ড দেয়। চলে যাওয়ার দিন এই কার্ডটি ফেরত দিলে জমা ১২০ উয়ান ফেরত দেবে।

চারতলায় যেতে হবে। এদেশের নিয়মানুসারে ৪ নম্বর বোতাম টিপলাম। লিফট দেখি নীচের দিকে নেমে চলেছে। কী হল, ভুল নম্বর টিপলাম? ব্যাপারটা ঠাওর করতে করতে লিফট থেমে গেল। নেমে দেখি চারতলাতেই এসেছি। তত্ত্বাবধায়ক মেয়েটি ঘরের চাবি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে ছিল। ১৪ নম্বর ঘরের দরজা খুলে দিল।

খাসা ঘর। একদিকে খাট, বিছানা, ছোট একটা টেবিলের ওপর ল্যাম্প। আরেকদিকে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা। লম্বা দর দালানের শেষ মাথায় শৌচালয়, স্নানঘর, ছেলেদের মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা। সুটকেসদুটো ঘরে দিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে ঢুকিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তত্ত্বাবধায়ক তার নির্দিষ্ট চেয়ারে সবসময়ই বসে থাকে। ঘরের নম্বর লেখা কার্ডটা দেখালে সে নিজে এসে দরজা খুলে দেবে।

লিফটে উঠে ১ নম্বর বোতাম টিপতেই লিফট ওপরদিকে উঠতে শুরু করল। আরে, আরে, এটা কী হচ্ছে! চারে টিপলে নীচে নামে, একে টিপলে ওপরে ওঠে। নম্বরগুলো উল্টোপাল্টা লাগানো আছে দেখছি। রাস্তায় এসে হোস্টেল বাড়িটার দিকে নজর করলাম। বেশ গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে। হোস্টেলের দুপাশের দুটো বাড়ি তিনতলা, কিন্তু হোস্টেলটা একতলা। কী করে তা হল! আমি যে চারতলায় আছি তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাহলে এর আর তিনটে তলা গেল কোথায়?

গভীর মনোনিবেশ করে ভেবে ভেবে জটিল সমস্যার সমাধান পেলাম— বাড়িটার একতলা ভূপৃষ্ঠে আর দুই, তিন, চারতলা ভূতলে। সেইজন্য লিফটে এক নম্বর বোতাম টিপলে ওপরে ওঠে আর চার নম্বর টিপলে নীচে নামে। আর সেইজন্যই চারতলায় কোথাও একটাও জানলা দেখিনি। তার মানে আমি এখন মাটির গর্তের মধ্যে বাস করছি।

আজ আর কোথাও যাওয়া নয়। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথ বেছে নিলাম। যেখানে আলোয় ঝলমলে দোকান নেই, যানবাহনের ব্যস্ততা নেই, পথচারীদের ভিড় নেই, আছে শুধু বসতবাড়ি, সেইরকম পথ বেছে নিয়ে চলেছি। লক্ষ্য আমার পথের দুধারে বাড়ির খোলা দরজা-জানলার দিকে। যতটুকু দেখে নেওয়া যায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী। এ গলি থেকে ও গলি, ও গলি থেকে সে গলি চলেছি। সবাই দেখে আমাকে। আমিও দেখি, কখনও হাত নাড়ি, কখনও 'নি হাও' বলি। ওরা মাথা নেড়ে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দেয়। ছোট ছোট দোকান, যাকে বলে পাড়ার দোকান। খাবারের দোকান, কেক-রুটির দোকান। নেড়েচেড়ে দেখি, দর জিজ্ঞেস করি, এগিয়ে চলি। হোস্টেলে ফিরে এলাম।

চারতলায়, এখন আর তলা বলা যাচ্ছে না, বলা উচিত, মাটির গর্তের তলায়,

যেখানে তত্ত্বাবধায়ক বসে তার কাছে একটা টেবিলের ওপর গরম জলের ফ্লাস্ক অনেকগুলো রাখা আছে। দুটো ফ্লাস্ক নিয়ে ঘরে এলাম। তাহলে জলের সমস্যা এখানে নেই। জল কিনে খেতে হবে না। লিউলিচিয়াও নানে ইনতু হোটেলে রোজ জল কিনে খেতে হয়েছে।

নিয়মমতো প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল। আর কারও ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে ফেলার উপযুক্ত সময়। সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম দরদালানের শেষপ্রান্তে। ছেলেদের মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা। একে একে সব সেরে স্নানঘরে চলেছি। ভেতরে ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হল। একজন ভেতরে আছে। একজন স্নান করছে দিগম্বর হয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দরজার পাশে। এমন সময় আরেকজন এলেন।

'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম,'ভেতরে একজন আছে।'

তিনি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, তিনি সব একে একে খুলে দেওয়ালে পেরেকে ঝুলিয়ে দিলেন, তারপর দাঁড়িয়ে পড়লেন একটা শাওয়ারের নীচে। বুঝলাম এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে নির্বুদ্ধিতা, একে একে সবাই আসবে, কাজ সেরে চলে যাবে। আমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। গামছা পরে তাড়াতাড়ি কোনওরকমে কাজ সেরে বেরিয়ে এলাম। এরাই আমাকে অসভ্য ভাবল কিনা কী জানি।

একটি ঘরের সামনে নোটিস ঝুলছে— দৈনিক ভ্রমণ, সামার প্যালেস, ফরবিডেন সিটি, পার্ল মার্কেট, ২৩০ উয়ান। আগামীকালের জন্য নাম লেখালাম। শরীরচর্চা করে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

হোস্টেলের কাছেই ওয়াং ফু চিং, এ শহরের সবথেকে ব্যস্ত রাস্তা। সবথেকে বড় বাজার এখানে। সুইডেনের স্টকহোম শহরে ড্রটিংহাম বাজার দেখে মনে হয়েছিল বুঝি পৃথিবীর সবথেকে বড় বাজার। এখন দেখছি ওয়াং ফু চিং তার থেকে অনেক বড়। দুপাশে দোকান, মাঝখানে মল বিরাট জায়গা জুড়ে। অনেক দূর থেকে দেখা যায় ওয়াং ফু চিং বুক স্টোর। ভেতরে ঢুকলাম। পেইচিং বুক বিল্ডিংয়ের মতো। প্রায় সম-আয়তনের। বইয়ের আয়োজন একইরকম। একইরকম ক্রেতাদের ভিড়, ট্রলিতে করে বই কিনছে, ছাত্রছাত্রীরা তাকের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কেউ লিখছে। তুলনায় কে কার থেকে বড় বিচার করা সহজ নয়। সেদিনের পছন্দ করা অভিধান এখানেও আছে।

বইয়ের দোকানের পাশে দ্য মলস অ্যাট ওরিয়েন্টাল প্লাজা। স্বয়ংসম্পূর্ণ আরেকটি বাজার।

গোলকধাঁধার মতো পথ। ভেতরে ঢুকে আর বেরিয়ে আসতে পারি না। নানান পথ দিয়ে যতবার বের হওয়ার চেষ্টা করি ততবার কোনও একটা দোকানে ঢুকে পড়ছি।

এখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে দিন শেষ। ফুটপাতের দোকান থেকে নুডল আর মাংস দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম ২ উয়ান ৫ মাওতে, বাংলায় আড়াই টাকায়।

সারাদিনটা কেটে গেল ঘুরপাক খেতে খেতে। পথের আলো জ্বলছে। দোকানে দোকানে আলোর রোশনাই। গোটা মল আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল। বহু মানুষের সমাগম হয়েছে মলে। তিয়ান আনমেন স্কোয়্যারের মতো মেয়েরা আসছে আমার সঙ্গে ছবি তুলতে। আবার কিছু মেয়ে আসছে অ্যান্নের মতো, নিজেদের স্টুডিওতে নিয়ে যেতে চায়, ছবি দেখাবে।

'আপনি তো চিনের শিল্পকলা দেখেননি। চলুন না, দেখবেন। এই কাছেই আমার স্টুডিও।'

স্টুডিও দেখিয়ে তারপর ছবি কিনতে অনুরোধ করে। এইভাবেই এরা নিজেদের পড়ার খরচ সংগ্রহ করে।

এক দোকান থেকে আরেক দোকানে এগিয়ে চলেছি জিনিস দেখতে দেখতে। মাঝে মাঝে দাম জিজ্ঞেস করি, দরাদরি করি। দরাদরি করে কতটা দাম কমানো যায় তা বুঝে নিয়েছি তিয়ান আনমেন স্কোয়্যারে। কমেরও কম থাকে। কোথায় গিয়ে থামবে আন্দাজ করা যায় না। সবার শেষে বলবে, শেষ দর দিয়ে যান। তখন হয় আরও মুশকিল। খুব কম করে বললেও যদি সেই দামে রাজি হয়ে যায় তখন মনে হবে আরও কমে দিত হয়তো। না কেনার ইচ্ছায় যদি অসম্ভবরকম কম দাম বলি তাতে রাগ করে না, হাসিমুখে বলে, পারব না।

বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির দোকানে ঢুকলাম। কতরকম বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র দেখতে দেখতে তাক লেগে যায়। এক জায়গায় আছে অঙ্গ সংবাহনের যন্ত্রপাতি। পিঠ ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, হাত ব্যথা, পা ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানান ব্যথা উপশমের জন্য হরেকরকম সাজসরঞ্জামের বিপুল আয়োজন। একেকটা বাক্স খুলে খুলে তার প্রয়োগ প্রদর্শন চলছে আমরা শরীরের ওপর। কড, কড, কড, কড, শির শির শির শির, টিপ টিপ টিপ টিপ কতরকম শব্দে, ছন্দে, তালে যন্ত্রগুলো সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে আমার শরীরের ওপর। বেশ আরাম বোধ হয়, আবেশে অবশ হয় তনু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করি। তারপর শুরু হয় দরকষাকষি।

'কত দাম?'

'৬টা ১২০ উয়ান।'

এই হল শুরু। তারপর দাম কমাতে দোকানি অর্ধেকে নেমে এল।

'নিন, ৬টা ৬০ উয়ান।'

'না, নেব না।' বেরিয়ে আসছি দোকান থেকে।

দোকানি বলে,'আপনার শেষ দাম বলে যান।'

কী বলি। আর কত কমানো যায়। ভেবে ভেবে বললাম, '৭টা ৫০ উয়ানে দেবেন?'

তাতেই সে দিয়ে দিল। এখন মনে হচ্ছে না, আরও কম বললে হত? দরাদরি করে জিনিস কেনায় ওই হল মুশকিল।

রাত বাড়ছে, মানুষের ভিড়ও বাড়ছে। দোকানে দোকানে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ছে। যেন কোনও উৎসব চলছে। মাঝে মাঝে একটি দুটি মেয়ে আসছে, আমার

পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। দুয়েকজন শিল্পকলার ছাত্রী একরকম জোর করেই নিয়ে গেল ওদের স্টুডিও দেখতে। তারপরেই ছবি কেনার জন্য অনুরোধ। কাল বেড়াতে যাওয়া আছে। রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরলাম।

পরদিন সকাল ৮টায় তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাতাল থেকে ওপরে উঠে লিফট থেকে নামতেই একটি মেয়ে বলল, 'আপনার ১৪ নম্বর ঘর?'

'হ্যাঁ।'

'চলে আসুন। এক্ষুনি গাড়ি আসবে।'

গাড়ি এসে গেল, এদেশের ছোট বাস। পনেরোজন বসতে পারে। আমরা পনেরোজনই আছি। আটজন চিনা আর সাতজন বিদেশি— হল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ের দুজন করে আর আমি।

ঘণ্টাখানেক পরে বাস থামল এক প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরে। একদল ভিখিরি পিছু নিল।

সামনে মস্ত বড় ফটক, মিং রাজাদের গ্রীষ্মাবাসের প্রবেশপথ। ব্রোঞ্জের বিরাট দুটো সিংহ ফটকের দুপাশে পাহারা দিচ্ছে। দুধার দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। মাঝখানে সিঁড়ি নয়, সরল পথ নীচ থেকে ওপরে উঠেছে। সরল পথে ড্রাগন খোদাই করা। ড্রাগনের ওপর দিয়ে যেত রাজশিবিকা। শিবিকায় রাজার একার আসন, আর কেউ নয়। সিঁড়ি দিয়ে যাবে অন্যরা, রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্র, মন্ত্রী এরা সব। তার তলার ধাপের মানুষের রাজপ্রাসাদে ঢোকার জো ছিল না। এই তো মাত্র সেদিন কুয়োমিনটাংয়ের শাসনকালেও সাধারণ মানুষের অনুমতি ছিল না রাজপ্রাসাদে ঢুকবার। আজ আমরা চলেছি ড্রাগনের দেহের ওপর দিয়ে, যেখান থেকে রাজশিবিকা যেত সেই পথ দিয়ে। কমিউনিস্ট শাসনকালে সব বাধানিষেধ উঠে গেল। এখন সবার জন্য খোলা রাজপ্রাসাদের দ্বার।

রাজগৃহের সামনে অলিন্দে, প্রাঙ্গণে নানান ধাতুতে গড়া জীবজন্তু— সিংহ, ময়ূর, সারস, আরও কত সব কাল্পনিক পৌরাণিক জীব। রানির ঘরের প্রাঙ্গণে পাথরে তৈরি এক ভাস্কর্য, তার অর্থ দুর্বোধ্য। মাঝখানে সিংহাসন। তার দুপাশে হাঁসের মাথায় বাতিদান। দেওয়াল বরাবর কারুকার্যশোভিত সিল্কের কাপড় ঝুলছে। একপাশে বুদ্ধের মূর্তি।

আরও কত ঘর। অফিসঘর, অতিথি আপ্যায়নের ঘর, মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজার পরামর্শ করবার ঘর, বসার ঘর, শোয়ার ঘর। একেক ঘরে একেক রাজার ব্যবহৃত জিনিসপত্র। ঘরে ঘরে কাচের দরজা। দরজায় আলোর প্রতিফলন হাত দিয়ে আড়াল করলে দেখা যায় ঘরের ভেতর সংরক্ষিত জিনিসপত্র। রাজার জন্মদিন পালন হত ঘটা করে একটা ঘরে। সে ঘরে আছে একটা কাঠের চেয়ার-টেবিল। দেখতে ছোট, কিন্তু তাকে তোলা নাকি পাঁচ-সাতজনের কম্ম নয়। চন্দনকাঠের আসবাবপত্র, মাটির বাসনপত্র, হাতির দাঁতের গাছ, অলঙ্কার, বাতিদান, আরও কত কী, বলে শেষ করা যায় না।

'ওইগুলো কিসের ঘর?'

'এটা রানির পোশাক বদলের ঘর। আর ওইগুলো সব রান্নাঘর।'

গোটাদশেক রান্নাঘর। তাহলে রাঁধুনি কতজন ছিল?

আরেকটা অপেরা ঘর। তিনতলা মঞ্চ। ওপরের ঘরটায় বসে রাজ পরিবার-পরিজন নাটক দেখত। প্রাসাদের বাইরে ব্রোঞ্জের তাঁবু।

লম্বা দরদালান প্রাসাদ থেকে সোজা চলে গেছে। তার মাথায় নকশা আঁকা সিলিং, দুপাশ নকশা করা কাচে ঘেরা। পথটা শেষ হয়েছে প্রাসাদের সরোবরের সামনে। ঘন নীল জলের সরোবরে পদ্মবন, সবুজ পদ্মপাতা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে দুধে আলতায় প্রস্ফুটিত পদ্ম। কী অপরূপ, কী মোহিনী রূপ। পদ্মবনের পাশে বাসন্তী মণ্ডপ। কত বসন্ত রাতে রানিরা এসেছে রাজার অভিসারে। সরোবরের ধারে রেলিং ঘেরা জায়গায় একটা ব্রোঞ্জনির্মিত ষণ্ড অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সরোবরের দিকে।

সরোবরের মধ্যে আছে পরীদের দ্বীপ। সরোবরের মাঝখান থেকে গেছে মার্বেল পাথরে তৈরি সেতু। সেতুর ১৭টা খিলান, তাই এর নাম হয়েছে 'সতেরো খিলানের সেতু'। সেতুর পাহারায় নিযুক্ত আছে সরোবরের পাশে একটা ঘেরা জায়গায় জেড রত্নে তৈরি চারটে সিংহ। সেতুর পাশে নৌকাঘাট। ঘাটে নৌকা বাঁধা। সে কী যে সে নৌকা! মার্বেল পাথরে তৈরি ড্রাগনপঙ্খী নাও। দুশো বছর আগের তৈরি। ঘসামাজা করে এখন জাহাজের রূপ নিয়েছে। সেকালে রাজারানিরা নৌকাবিহার করত সরোবরে, এখন আমরা নানান দেশের মানুষ জুটেছি নায়ে চড়ে সরোবর পাড়ি দেব বলে। পকেট থেকে সবাইকে ৮ উয়ান করে দিতে হল নৌকাভাড়া।

সরোবরের এপারে আমাদের বাস অপেক্ষা করছে। এখান থেকে যাওয়া হল মুক্তোর বাজারে। মুক্তোর কারখানার সামনে একটা মস্ত বড় জল ভর্তি ড্রাম রাখা আছে। তার মধ্যে ছাড়া আছে অনেক ঝিনুক। ঝিনুকগুলো হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখানোর জন্য এলেন একজন প্রদর্শক। একটা লম্বা হাতা দিয়ে একটা ঝিনুক তুলে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো এর মধ্যে কটা মুক্তো পাওয়া যাবে?'

একটা, দুটো, তিনটে যার যেমন ইচ্ছা একটা করে সংখ্যা আমরা বললাম। প্রদর্শক ঝিনুকের মুখ খুলে দেখালেন। গুনে দেখি ঝিনুকের পেটের মধ্যে ৮টা উজ্জ্বল ঝকঝকে মুক্তো আছে।

ঢোকা হল মুক্তোর কারখানায়। কাচে ঘেরা ছোট ছোট একেকটা ঘরে একেকজন শিল্পী মুক্তোর অলঙ্কার তৈরি করছে। বিক্রির জন্য প্রদর্শনীঘরটি মুক্তোর আলোয় বিভাসিত। মুক্তোর হার, দুল, আংটি—আরও কত গয়না সাজানো কাচের আলমারিতে। অনেকে কিনছে। আমি একটু হাত বুলিয়ে সুখ ভোগ করি।

মুক্তোর বাজার থেকে যাওয়া হল 'স্বর্গের মন্দির'। স্বর্গের দেবতারা নাকি কোনও এককালে এখানে নেমে এসেছিল। রাজপরিবার এই মন্দিরে বৃষ্টি আর ভালো ফসলের জন্য প্রার্থনা করত। প্রার্থনার জন্য ঘর আছে। মন্দিরের স্থাপত্যনকশা, আকৃতি, কারুকার্য শুধু প্রাচীন চিনের নয় বিশ্বমানবসভ্যতার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন।

অনেক উঁচু চাতালের ওপর মন্দির, সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠে তবে মন্দিরে পৌঁছনো

যায়। উঠতে গিয়ে দলছাড়া হয়ে গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে নীচে নেমে রাস্তায় এসে পেলাম সবাইকে।

গাইড মেয়েটি বলল, 'এখন আমরা মধ্যাহ্নভোজ করব, তারপর যাব ফরবিডেন সিটি।'

দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাগাভাগি করে উঠলাম সবাই।

গাড়ি চলেছে একটা বাগানের মধ্য দিয়ে। বাগানে ফুলগাছ নেই, আছে শুধু ঘাস। ধাপে ধাপে সবুজের আস্তরণ যেন সবুজ ঢেউ দুলে দুলে যাচ্ছে। তার মাঝে মাঝে বড় বড় পর্ণমোচী মহীরুহ চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে শীতল করে রেখেছে বাগানটাকে। মাঝ বরাবর গেছে মসৃণ পথ।

গাড়ি থামল প্যাগোডার নকশায় তৈরি এক বাড়ির সামনে। অনেক প্রশস্ত একটা ঘরের একপাশে শিল্পদ্রব্যের দোকান, অন্য পাশে খাবার ব্যবস্থা। তিনটে গোল টেবিলে পাঁচজন করে বসলাম। টেবিলের ওপর একটা গোল কাচ। কাচের ওপর খাবার ভর্তি বড় বড় বাটি সাজিয়ে রেখে যাচ্ছে একটি মেয়ে। সবশেষে সবার সামনে রেখে গেল একটা করে ছোট বাটি, একটা করে ছোট ডিশ, চামচ, কাঠি আর জল ভর্তি গ্লাস। এই শেষ বস্তুটি দেখে আশ্চর্য ঠেকছে। রেস্টুরেন্টে জল এই প্রথম দেখছি। বড় ডিশ বা থালা দেয়নি তো। খাব কিসে? চামচটা হাতে নিয়ে দেখছি সবাই কী করে।

যার সামনে ভাতের বাটি আছে সে তিন-চার চামচ ভাত তুলে নিল ছোট বাটিতে। তারপর একটা আঙুল দিয়ে কাচটাকে ঠেলে দিল। কাচের চাকাটা ঘুরে ভাতের বাটি চলে গেল পাশের জনের সামনে, আর প্রথমজনের সামনে এল একটা মাংসের বাটি। দু-চামচ মাংস তুলে নিয়ে ছোট ডিশটায় রেখে আবার ঠেলে দিল কাচের চাকাটা। ততক্ষণে দ্বিতীয়জনের ভাত নেওয়া হয়ে গেছে। এমনি করে কাচের চাকার আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে রেখে সবাইকে খাবার তুলে নিতে হচ্ছে। বেতাল হয়ে গেলেই মুশকিল, ভালো একটা পদ হয়তো নাগালের বাইরে চলে যাবে। চাকাটা পুরো এক পাক ঘুরে এলে তবে সেই লোভনীয় বস্তুটি পাওয়ার সুযোগ আসবে। সুযোগ যখন এল তখন হয়তো দেখা গেল বাটিটা ততক্ষণে ফাঁকা। তারপর বাটি থেকে এক চামচ ভাত নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে এক চামচ মাংস নেয়। মুখের মধ্যে গিয়ে ভাতে মাংসে মাখামাখি হবে, তার আগে মাখামাখির কোনও সুযোগ নেই।

গাইড মেয়েটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার কিছু বিশেষ খাবার চাই কিনা। আমি বললাম, এগুলো সবই বিশেষ খাবার। কোনও অসুবিধে নেই।

এদেশের রান্নার সুখ্যাতি বিস্তর করা হয়েছে। তবু বলতে ইচ্ছে হয়, পাত ছেড়ে উঠতে মন চায় না।

খাওয়া শেষে ওই গাড়িতে ফিরে গেলাম স্বর্গের মন্দিরে। সেখানে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করে আছে। এখন যাওয়া হবে নিষিদ্ধ নগরী।

সেই প্রথমদিন এসেছিলাম শিয়ার সঙ্গে। নগরীর প্রবেশদ্বার তিয়ান-আনমেন ঘুরে ঘুরে দেখার পর আর সময় হয়নি।

৩,৪২৮ মিটার দীর্ঘ, উচ্চতায় ১০ মিটার প্রাকারবেষ্টিত এই নগরী হল প্রকৃতপক্ষে মিং আর চিং রাজাদের প্রাসাদ। ৭,২০,০০০ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এই

রাজপুরীতে আছে বড় বড় দালানবাড়ি। সবই প্যাগোডার নকশায়, ঢাল হয়ে চাল নেমে গেছে ওপর থেকে নীচের দিকে। প্যাগোডার রঙে রঙিন। একেকটা দালান মানে একেকটা প্রাসাদ। সবকটা প্রাসাদে মোট ৯,০০০ ঘর আছে। ১৪০৬ সালে তৈরি হয়েছে এই রাজপ্রাসাদ। ২৪ জন মিং আর চিং সম্রাট রাজত্ব চালিয়েছেন এখান থেকে। ৫২ মিটার চওড়া আর ৩,৮০০ মিটার দীর্ঘ এক পরিখা দিয়ে ঘিরে দুর্গনগরী তৈরি হয়েছে। এরই নাম নিষিদ্ধ নগরী। নগরীপ্রমাণ বিশাল রাজপুরীতে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাই তার এই নামকরণ। নগরীর চার কিনারায় প্রাচীর ফুটো করে উঠেছে চারটি সমৃদ্ধ চূড়া। নগরীর ভেতরে আছে কৃত্রিম সরোবর, নদী, পাহাড়, আরও কত কৃত্রিম নিসর্গ-বৈচিত্রে বিরচিত প্রমোদ উদ্যান। সবুজ পাইনগাছের সারি, নানা রঙে বিকশিত মনোরম ফুলের বাগান, সরোবরের কিনারায় বিরামঘর। জীবনের প্রথম তারুণ্যে একদিন আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে পাল্কি চড়ে এই প্রাকারবেষ্টিত হর্ম্যতলের অন্দরমহলে প্রবেশের পর জীবদ্দশায় প্রকৃতির সৌন্দর্য-শোভা উপভোগ করবার সুযোগ ছিল না তো রানি আর অগণন উপপত্নীদের, তাই ভোগ-বিলাসের এই বিপুল আয়োজন।

নগরীর দুটো অংশ— বহির্মহল আর অন্দরমহল। প্রাসাদগুলি ভাগাভাগি করে আছে দুই মহলে। একেক প্রাসাদের একেক নাম। বহির্মহলে রাজদরবার বসত যে প্রাসাদে, তার নাম 'পরম ঐকতান'। 'পরম ঐকতান' প্রাসাদের প্রাঙ্গণের সামনে একটি নদী বানানো হয়েছে, তার নাম 'সোনালি জলের নদী'। এমন সব কাব্যিক নাম আরও আছে— 'জাগতিক প্রশান্তি,' 'মনোন্নয়ন সাধন', 'পুঞ্জীভূত আড়ম্বর', এইরকম আরও কত। নদীর ওপর পাঁচটি শ্বেত মার্বেল পাথরের সেতু প্রাঙ্গণের মাধুর্য বাড়িয়েছে। মাঝখানের সেতু বরাবর মার্বেলে মোড়া পথ চলে গেছে দরবার প্রাসাদ পর্যন্ত। দরবারের কেন্দ্রস্থলে আছে রাজ সিংহাসন। ছয়টি স্থূলকায় স্বর্ণাভ গোলাকৃতি স্তম্ভে জড়িয়ে আছে ড্রাগন। সিলিংয়ের কেন্দ্রস্থলে আছে ড্রাগন আর রূপকথার পক্ষী ফিনিক্স, তার নীচে গোলাকৃতি আয়না। স্বর্ণালী ড্রাগনখচিত সিংহাসনের পিছনে স্বর্ণাভ পর্দা, একপাশে ব্রোঞ্জনির্মিত গজ, অন্য পাশে সারস। দরবারের সম্মুখ ভাগে একটি ব্রোঞ্জনির্মিত কচ্ছপ। এছাড়াও মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজার শলাপরামর্শের জন্য, প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য রাজার বসবাস ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য, উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য আছে আরও অনেক প্রাসাদ। শুধু রাজার নিত্যদিনের কাজকর্মের জন্য আছে তিনটি প্রাসাদ। সব নামের মানে জানি না। তাই আর লেখার চেষ্টা করিনি।

অন্দরমহল ছিল বসবাসের জন্য। সেখানে আছে রাজা, রানি, রাজকুমার, রাজকন্যাদের আর রাজার অগণিত উপপত্নীদের বসবাসের জন্য প্রাসাদ। একেকজনের জন্য একেকটি প্রাসাদ। সে যে কত প্রাসাদ তা গোনা যায় না, দেখে শেষ করা যায় না। এখানেও প্রত্যেক প্রাসাদের একেকটা নাম আছে। প্রত্যেক প্রাসাদের প্রাঙ্গণে আছে সারস, সিংহ, কচ্ছপ, হরিণ আর রূপকথার কাল্পনিক জন্তুর ভাস্কর্য, কোনওটা ব্রোঞ্জনির্মিত, কোনওটা বা জেডনির্মিত। আছে জেডনির্মিত আধারে সবুজ গাছ, সোনালি ফুলের ভাস্কর্য, ধূপদানি, বাসনপত্র, ব্যবহার্য জিনিসপত্র। অগ্নি

নির্বাপণের জন্য ব্রোঞ্জনির্মিত বড় বড় জলের পাত্র রাখা আছে সারি দিয়ে।

একটি প্রাসাদ হয়েছে ঘড়ির সংগ্রহশালা। দেশবিদেশে তৈরি কত ঘড়ি রাখা আছে সেখানে! একটি ঘড়ি আছে, সেটায় ঘণ্টা বাজার সময় একটি পুতুল নীচ থেকে ঘড়ির মাথায় উঠে ড্রাম বাজায়, ঘড়ির চারপাশে সাজানো ফুলগুলি নড়েচড়ে ওঠে। ১৭৯৮ সালে তৈরি একটা ঘড়িআছে। ঘড়িটি এখনও সচল আছে। রাজবংশের শেষ রানি যে পাল্কিতে চড়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন সেটি সযত্নে রাখা আছে। আছে একটি মুক্তোখচিত স্বর্ণগোলক। আরও কত বিচিত্ররকমের সেকালের জিনিসপত্র আছে। সবকিছুর নাম জানা নেই। জানা থাকলেও লিখতে লিখতে আমার নোটবইয়ের পাতা ফুরিয়ে যাবে তবু লেখা শেষ হবে না।

প্রমোদ উদ্যানের প্রবেশপথটির দুপাশে দুটি মহীরুহের বাকলবিহীন কাণ্ডে বিকশিত শুষ্ক কাঠ তাদের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। গাছদুটির ওপর দিকে দুটি ডালে কলম কেটে জোড় দেওয়া হয়েছে। এই সুদৃশ্য জোড়বাঁধা মহীরুহ দুটির বিশেষ অর্থ বহন করছে— আকাশে আমরা পাখির মতো উড়তে চাই, আর মাটিতে জোড়বাঁধা গাছ হয়ে থাকতে চাই। এর অর্থ, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বন্ধন থাকবে অবিচ্ছেদ্য এক টানা সরলরেখায়।

নগরী থেকে বেরিয়ে আসার পথে দেখা হল এক অপরূপ শিল্পকীর্তি— রঙিন কাচে মোড়া দীর্ঘ প্রশস্ত প্রাচীরের গায়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নৃত্যরত ৯টি ড্রাগনের ছবি।

১৯৪৯ সালে চিন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর নিষিদ্ধ নগরীকে সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখন এর নাম হয়েছে 'প্রাসাদ সংরক্ষণশালা'। এখন আর নিষিদ্ধ নয়, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, জনতার কলহাস্যে মুখরিত। এই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তিকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই অক্ষয়কীর্তি নয়া চিনের প্রতীক।

তোং থান ফিরতে বিকেল ছটা হল। তারপরেও ঘণ্টা দুই-তিন কাটালাম ওয়াং ফু চিন মলে। অনেক মেয়ে এগিয়ে এল আলাপ করতে। সবাই পড়াশুনা করে, কেউ ডাক্তারি পড়ে, কেউ পর্যটনবিদ্যা পড়ে, কেউবা ভাষাতত্ত্ব পড়ে। আবার নতুন নতুন শিল্পকলার ছাত্রীরা আসে। তাদের স্টুডিও দেখাতে নিয়ে যায়।

পথ দিয়ে চলতে চলতে অ্যান্নে নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল, যার স্টুডিও দেখতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ওর বান্ধবী সান।

'বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।' অ্যান্নে বলল।

'এখানে সবজির বাজার কোথায় আছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেন, কী কিনবেন?'

'পিঁয়াজ কেনা দরকার ছিল।'

ওরা নিয়ে গেল সবজির বাজারে। পিঁয়াজ কিনে ওদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল অনেকটা সময়। পরোটা আর মাংস ভরা রুটি দিয়ে দুপুরের খাওয়া হয়ে গেল। খাওয়ার খরচ বেশ কম। তাই লাঞ্চব্যাগের খাবার খরচ না করে কদিন কিনেই খাচ্ছি। এখনও বাকি আছে তিনটে দেশ— মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান। খাবার

সঞ্চয় করে রাখাই ভালো।

অন্য এক নতুন রাস্তা দিয়ে চলেছি। পথের পাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা বাগান দেখে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ভেতরে ঢুকে বুঝলাম এটা বাগান নয়, পার্ক। এক জায়গায় একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে সাত-আটজন মহিলা ও পুরুষ। টেবিলের ওপর রাখা আছে টেলিফোনের ডায়ালের মতো কয়েকটা যন্ত্র। এগুলি তাপযন্ত্র। তাপযন্ত্রগুলির সঙ্গে তার সংযোগ করা আছে। তারের অন্য প্রান্তে লাগানো আছে ব্যথা নিরাময়ের জন্য অঙ্গসংবাহক যন্ত্র। প্রত্যেকে একটা করে অঙ্গসংবাহক যন্ত্র নিজের শরীরে ধারণ করে আছে, কাঁধে, পিঠে, হাঁটুতে, ঘাড়ে, যার যেখানে সমস্যা। তাপযন্ত্রটার ডায়াল নম্বর টিপে টিপে সবাই উত্তাপ বাড়াচ্ছে বা কমাচ্ছে যার যেমন দরকার বা যার যেমন সহ্যশক্তি সেই অনুসারে।

এরকম চিকিৎসা আমাদের দেশে ডাক্তারখানায় গিয়ে হয়ে থাকে। এর বিকল্প ব্যবস্থা আছে ঘরে বসে গরম সেঁক দেওয়া। একেবারে বিনামূল্যে চিকিৎসা। এদেশে কেন দলবেঁধে খোলা মাঠে বসে সবাই এসে বসেছে? মনে হয় ব্যয়সাশ্রয়ের ব্যাপার আছে। কারণ সাত-আটজন রুগিকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একজন সাহায্যকারী আছে।

আরেক জায়গায় রেডিওতে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। রেডিও ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনেকজন। সঙ্গীতের তালে তালে দুজন করে হাত ধরাধরি করে নাচছে, বলড্যান্সের তালিম নিচ্ছে। দলে নতুন যারা তাদের একজন দেখিয়ে দিচ্ছে।

আরেকপাশে কয়েকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাডমিন্টন খেলার শাটলের মতো কিছু একটা নিয়ে তারা এক পায়ের ওপর রেখে ওপর দিকে ছুঁয়ে দিয়ে পায়ের ওপরেই ধারণ করবার চেষ্টা করছে, প্রথমে এক পায়ে, তারপর এক পা থেকে অন্য পায়ে, তারপর একের পা থেকে অন্যের পায়ে, এইভাবে।

আরেকপাশে একজনমাত্র লোক একটা লম্বা তরোয়াল নিয়ে নানান কায়দায় কসরত দেখাচ্ছে। একপাশে দড়ি নিয়ে লাফালাফি হচ্ছে। আরেকপাশে ব্যাডমিন্টন খেলা চলছে।

আমি নোটবইটা খুলে মেলাবার চেষ্টা করছি কোন খেলার কী নাম হতে পারে। ওরা একদল এসে আমায় ঘিরে ধরল, খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'নি ইনতু রেন?' (আপনি ভারতীয়?)

অবাক হয়ে দেখে সবাই আমাকে।

পার্কের আরেকদিকে পাহাড় বানানো হয়েছে। পাহাড়ের ওপর ঘন গাছপালা আছে, চলার রাস্তা আছে, বসার জায়গা আছে।

পেইচিং শহরে এরকম প্রমোদ উদ্যান অনেক আছে। এগুলোর নাম কালচারাল পার্ক। বিনোদনের কতরকম ব্যবস্থা থাকে এই উদ্যানে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোগ করো, সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশে শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিকচর্চা। লিউলিচিয়াও নানে দেখেছিলাম লিয়ান হুয়া চি পার্ক। পেইচিং ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও শহরে এমনটি দেখিনি।

উদ্যান থেকে বেরিয়ে চলেছি। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন চলা। না দেখা পথ, অচেনা

গলি দেখলেই ঢুকে পড়ি।

পথের ধারে ভাজা হচ্ছে পরোটা। মস্ত চাটু চাপানো আছে স্টোভের ওপর। এসব দেখলেই পেট খাই খাই করে। দেখতে দেখতে লাইন লেগে গেল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম লাইনে। আমরা যেমন দেখি সন্ধেবেলা পথের ধারে এগরোল ভাজা হয় চাটুতে। প্রায় ওই আকারের চাটুজুড়ে ভাজা হচ্ছে। বিরাট আয়তনের জিনিসটাকে পরোটা না বলে ধোসা বললে কিছুটা মানানসই হয়। মসলা ধোসা নয়, সাদা ধোসা। মানে ওর মধ্যে আলুর কী অন্য কিছুর তরকারি দিচ্ছে। ভাজা হয়ে গেলে চার ভাঁজ করে পলিথিন প্যাকেটে পুরে দিয়ে দিচ্ছে। আসল নামটা কী, লাইনের লোকদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল বটে কিন্তু তা আর মনে নেই। কত জিনিস দেখছি বাইশদিন ধরে। জিজ্ঞেস করে করে জেনেওছি সব নাম। কিন্তু সব নাম মনে রাখতে হলে সঙ্গে সঙ্গে খাতাকলম বের করতে হয়। তা সবসময় হয়ে ওঠে না। ভাবি, এ তো মনে থাকবে। একটু পরেই দেখি ভুলে গেছি। তা না হলে একহাতে নোটবই অন্য হাতে পেন্সিল নিয়ে পথ চলতে হয়,— এই দেখো নোটবুক, পেন্সিল এ হাতে— এমনিভাবে। দুটো হাতকে ওইভাবে সবসময়ের জন্য ব্যস্ত রেখে কি পথ চলা যায়?

ওয়াং ফু চিং মল দিয়ে হেঁটে চলেছি। একটি মেয়ে এসে বলল,'আমার ভাই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।'

সুকুমার বালক। এই প্রথম কোনও ছেলে এসেছে আমার সঙ্গে আলাপ করতে।

'এসো, কাছে এসো।'

মেয়েটি বলল, 'ও তো ইংরিজি স্কুলে পড়ছে। তাই আপনার সঙ্গে একটু ইংরিজিতে কথা বলবে।'

'বাঃ! খুব ভালো। তোমার নাম কী? ইংরিজিতেই বললাম।

বড় লাজুক ছেলে। খুব আস্তে আস্তে কী বলল ভালো করে শুনতে পেলাম না। কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

'বল, তুমি কী জানতে চাও।'

খুব ক্ষীণ কণ্ঠে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল দু-চারটি কথা। আমি কোন দেশ থেকে এসেছি। আমার পোশাকের নাম কী, কেমন লাগছে এখানে, ভারতে ওর খুব যেতে ইচ্ছে করে, এইসব। খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল। আমি জবাব দিলাম। ও খুব খুশি।

'তোমার যাত্রা শুভ হোক' বলে ছেলেটি দিদির সঙ্গে চলে গেল। সারাদিন মলে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। অ্যান্নে আর সানের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে ঘুরলাম বড় বড় দোকান। ওরা কেনাকাটা করল, আমি শুধু দেখলাম। বড় বড় বিভাগীয় বিপণি। দেখতেই বেশ ভালো লাগে। একেকটা জিনিসের জন্য একেকটা বাজার। একটা মিষ্টির দোকান দেখে তো চোখে ভিরমি লেগে যায়। মিষ্টি মানে আমাদের মতো সন্দেশ, রসগোল্লা তো নেই, কেক, রুটি, লজেন্স, শুকনো ফলের লজেন্স, কিসমিস, খেজুর আরও কত কী বিচিত্র জিনিস। ওদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দুচারটে চেখে দেখার সুযোগ হলো। এসব জিনিসের এত বড় দোকান আমাদের কোনও শহরে দেখা যায় না।

সন্ধের পর থেকে আবার সেই শিল্পকলা পড়ুয়াদের অনুরোধ, আবার কেউ আসছে— একটা ছবি তুলব আপনার পাশে দাঁড়িয়ে? এ অনুরোধ চলছেই প্রতিদিন। অনুরোধ রাখতেও আমার কোনও অসুবিধে নেই।

আজ চিনে শেষদিন। কাল সকালে চলে যাচ্ছি মঙ্গোলিয়া। হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছি কী দেখা হল আর কী দেখা হল না।

ইউনেস্কোর বিশ্ব-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের তালিকায় চিন দেশে সংরক্ষিত প্রাচীন প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক দশটি দর্শনীয় স্থান ও বস্তুর নাম স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে গর্বিত চিন। এত গৌরবের অধিকারী বুঝি তামাম দুনিয়ায় আর কোনও দেশ হতে পারেনি। তার মধ্যে মাত্র চারটি দেখা হল— মহাপ্রাচীর, গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ, স্বর্গের মন্দির আর প্রাসাদ সংরক্ষণশালা। এত বড় দেশ। তার সবকিছু দেখা কি ২৫ দিনে হয়! ভিভিয়েন ওয়াং বলেছিল, 'যদি আবার আসেন ২০০৮ সালে অলিম্পিক খেলার পর আসবেন।' যদি সত্যিই আবার আসা হয় তখন দেখা হবে আরও কিছু। অন্তত আমাদের পূর্বপুরুষ আদি মানবজাতির বাসগৃহ লোংকুশান পর্বত দেখতে যাব নিশ্চয়ই।

চলে গেলাম শিতান। পেইচিং বুক বিল্ডিং থেকে সেই পছন্দ করা অভিধানটি কিনে নিয়ে এলাম।

ফিরে এলাম ওয়াং ফু চিং। একটা ১০ উয়ানের দোকানে ঢুকলাম। মানে এ দোকানে যা কিছু পাওয়া যায় সব ১০ উয়ান। তাই বলে ফুটপাতে পায়া ভাঙা খাটের ওপর মাল ঢেলে দিয়ে 'যা লেবে দশ রুপিয়া' মার্কা দোকান ভেবে হেলাফেলা করবেন না যেন। মস্ত দোকান। বহু বৈচিত্রের জিনিস, তাক লাগানো জিনিসের বিপুল সমারোহ। কাচের আলমারিতে থরে থরে সাজানো। কানাডার মন্ট্রিলে দেখেছি এক ডলারের দোকান। যা কিছু আছে দাম এক ডলার (কানাডার ডলার)। জর্ডনের আম্মান শহরেও আছে এক ডলারের দোকান। এখানে ১০ উয়ান। সেও এক ডলারই হল প্রায়।

গোটাকয়েক জিনিস কিনলাম এখান থেকে।

সারি সারি তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদের দোকান। খুব দামি দামি জিনিস। হইহই করে খরিদ্দার ডেকে ডেকে বিক্রি হচ্ছে। বিশ্বাস হয়, এদের নাকি একসময় পরনের ভালো জামাকাপড় জুটত না। শীতের দিনে জামার নীচে তুলো গুঁজে দিয়ে শীত আটকাত?

একটা সিল্কের কাপড়ের দোকানে ঢুকলাম। চিনের সিল্ক ঐতিহ্যবাহী বস্তু। প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যপথের নামই হয়ে গেল সিল্ক রুট, সেকালের চিনের প্রধান বিদেশবাণিজ্যের পথ।

সিল্কের গোটাকয়েক রুমাল সংগ্রহ করে নিলাম। সন্ধের আগেই ঘরে এসে আগামীকালের প্রস্তুতি সেরে ফেললাম।

সকাল পাঁচটায় জিনিসপত্র নিয়ে মাটির গর্ত থেকে ওপরে উঠে এলাম। ঘরের নম্বর লেখা কার্ড ফেরত দিয়ে ১২০ উয়ান ফেরত দিলাম। ঘরভাড়া আগেই মিটিয়ে দেওয়া ছিল।

ট্যাক্সি নিয়ে পেইচিং স্টেশন। স্টেশনে ট্যাক্সি যে জায়গায় দাঁড়ায় স্টেশন তার থেকে বেশ একটু দূরে। যেতে হবে সেতু পেরিয়ে। দুহাতে দুটো বোঝা নিয়ে যাওয়া একটু কষ্টসাধ্য। এক রিকশাওয়ালা এসে হাজির হল।

'কত নেবে?'

সে দুটো আঙুল দেখাল। মাত্র দু উয়ান। চলো। উঠলাম রিকশায়।

স্টেশনে নেমে পকেট থেকে দু উয়ানের খুচরো পয়সা দিতে গেলাম। সে মুখ বাঁকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের পকেট থেকে দুটো দশ উয়ানের নোট বের করে দেখায়। বলে কী। দুটো আঙুল মানে কি কুড়ি? সে যুক্তি মানে না। আমিই বা এককথায় কুড়ি উয়ান দিই কী করে। সাক্ষী মানি আশপাশের দু-চারজন লোককে। তারা সব নিরুত্তর থেকে মৌন সম্মতি জানাল রিকশাওয়ালাকেই।

কী করি। দেরি করা যাচ্ছে না। দেরি করে যে লাভ হবে সেরকম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই দুটো দশ উয়ানের নোট দিতে তবে তার শান্তি হল। এ যেন দিনেদুপুরে জনসমক্ষে ডাকাতি। শেষদিন শেষ সময়ে একবারে বেকুফ বানিয়ে দিল আমাকে।

মনে মনে বৃথা আস্ফালন করতে করতে সেইদিনের দেখে যাওয়া প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছলাম। তখন ৬টা বাজে। ট্রেন ছাড়বে ৭টা ৪০ মিনিটে। ঢের সময় হাতে। ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উলান বাতোরের ট্রেন ছাড়বে। প্ল্যাটফর্মের গেটে তালা লাগানো। দুই-তিনজন যাত্রী অপেক্ষা করছে।

ক্রমে ক্রমে ভিড় বাড়তে শুরু করল। গেট খুলল ৭টায়। অভিবাসন দপ্তরের কোনও হাঙ্গামা এখানে নেই বোঝা গেল।

স্টেশনের ঘড়িতে ৭টা বেজে ৪০ মিনিট হয়েছে। ট্রেন ছাড়ল। এ গাড়ি হল আরামে যাওয়ার গাড়ি। সব কামরাতেই ক্যুপে। একেকটা ক্যুপেতে চারজনের ব্যবস্থা। নীচে দুজন ওপরে দুজন। রাত্রে ক্যুপের দরজা আটকে দিয়ে শুয়ে পড়লে একেবারে নিশ্চিন্ত। আমার ক্যুপেতে আমি ছাড়া আছে আরেকটি পরিবার, স্বামী, স্ত্রী আর তাদের দুটি শিশুকন্যা। কামরার সেবিকা সবার জন্য একটা করে রাতে গায়ে দেওয়ার চাদর, বালিশের ঢাকনা আর তোয়ালে দিয়ে গেল। যাওয়ার সময় হাতের ইশারায় সে আমাকে ডাকল। তার পিছু পিছু চললাম। অন্য একটা ক্যুপের সামনে এসে বলল, 'আপনি এই ক্যুপেতে চলে আসুন। ওটায় ওরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকবে, আপনার অসুবিধে হবে। এখানে আরেকজন মাত্র যাত্রী, আরামে যেতে পারবেন।'

অতি চমৎকার প্রস্তাব। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে এলাম। চার নম্বর ক্যুপে থেকে এক নম্বরে চলে এসেছি। পাশেই শৌচালয়। ঝকঝকে পরিষ্কার কমোড, জলের ব্যবস্থা। মহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। কুয়াং ছুয়ো থেকে পেইচিং রেলযাত্রার দুঃখ ঘুচল এবার।

একজন মাত্র আমার সঙ্গী, এক ইজরায়েলি যুবক। নাম ইয়োসি। ইয়োসির সঙ্গে গল্প করতে করতে সময় বেশ কেটে যায়। একটা গল্পের বই পড়ছিল। পড়া শেষ করে বইটা আমাকে উপহার দিল।

উপুড় হয়ে শুয়ে জানলার কাচের ভেতর থেকে বাইরের দিকে চেয়ে আছি।

পাহাড়িপথ দিয়ে চলেছি। একের পর এক পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে। কখনও কখনও ছোট ছোট স্টেশনে ট্রেন থামছে অল্প সময়ের জন্য। দিনান্তে পৌঁছলাম চিনের সীমানায়।

অশান্ত মন ছুটে বেড়ায় শেন চেন থেকে কুয়াং ছুয়ো, কুয়াং ছুয়ো থেকে মহাপ্রাচীর, লিউলিচিয়াও নান থেকে তিয়ান-আনমেন, পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেলস্টেশন, শিতান থেকে ওয়াং ফু চিং, রাজপ্রাসাদ থেকে প্রাসাদ সংগ্রহশালায়।

বেলা শেষ। আমি এবার যাই। ছাও উয়ানউয়ান, আমি যাই। লি কুয়াং, আমি যাই।
ও শিয়া, ও পাও ও লুও মিন যেতে চায় না যে মন, তবু যেতে হবে। আমি যাই।
ব্যস্ত মেয়ে ফাং, দুষ্টু মেয়ে ছাং, ভিভিয়েন, আসব আবার এবার আমি যাই।

মোঙ্গোলিয়ার তাঁবুতে রাত্রিবাস

সকাল সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে পেইচিং স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল। কুয়াং ছুয়ো থেকে পেইচিং এসেছিলাম সারারাত বসে বসে। সে ট্রেনে ঘুমোবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, বসেই যেতে হয়। এখন যাচ্ছি ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথে। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ, মস্কো থেকে পেইচিং পর্যন্ত এই রেলপথের বিস্তৃতি। একেকটা কামরার মধ্যে অনেকগুলো করে ছোট ছোট কামরা থাকে, যাকে বলে ক্যুপে। একেকটা ক্যুপেতে চারজন করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারে— দুজন নীচে, দুজন ওপরে। ৪ নম্বর কামরায় ৮ নম্বর ক্যুপেতে ৩০ নম্বর সিটটা আমার, ২৯ নম্বরের মাথার ওপর।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত ক্যুপেতে আমি একা। ভেবেছিলাম আর কেউ হয়তো উঠবে না, একাই আরামে যেতে পারব। শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। এক চিনা ভদ্রলোক এসে দখল করলেন তিনটে সিট। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর দুটি শিশুকন্যা।

ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই বুকে তকমা লাগানো এক মহিলা এসে সবার টিকিট চেয়ে নিলেন, চা পানের জন্য ২ উয়ান করে সংগ্রহ করে নিলেন আর একটা করে বড় প্যাকেট সবাইকে দিয়ে গেলেন। প্যাকেটের মধ্যে দুটো চাদর, একটা বিছানায় পাতার জন্য আর একটা গায়ে দেওয়ার জন্য, একটা বালিশের ঢাকনা আর একটা তোয়ালে। তারপরেই এলেন এক টিকিট পরীক্ষক। অভিবাসন দপ্তর আর শুল্ক বিভাগের দুটি আবেদনপত্র দিয়ে ইশারায় আমাকে ডাকলেন। তাঁর পিছু পিছু গেলাম কামরার গোড়ায়। ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওখানে ওরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে, আপনার অসুবিধে হবে। আপনি এই ২ নম্বর ক্যুপেতে চলে আসুন, অনেক আরামে যেতে পারবেন। এখানে একজন যাত্রী আছে।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। জিনিসপত্র নিয়ে চলে এলাম। একজন মাত্র যাত্রী, এক ইজরায়েলি যুবক। পাশেই শৌচাগার। ঝকঝকে পরিষ্কার, ঠিক যেমনটি উড়োজাহাজে থাকে। বেশ আরামেই যাওয়া যাবে।

পাহাড়ি পথ দিয়ে ট্রেন চলেছে। অনেকগুলো সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে এখন চলেছে সমভূমির ওপর দিয়ে। ডানহাতে ভুট্টার খেত, বাঁহাতে সূর্যমুখী ফুলের খেত। সবুজে হলুদে মাখামাখি। আবার কখনও দুটো একটা কারখানা পিছন দিকে চলে যাচ্ছে হুশ হুশ করে।

রাত ৮টা বেজে ৫৫ মিনিটে ট্রেন থামল চিনের সীমান্তে। চিন থেকে বিদায় নেবার আবেদনপত্র পূরণ করে টিকিট পরীক্ষকের হাতে দিলাম। শুল্ক বিভাগের লোক এল তল্লাশি করতে। লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু নিয়ে যাচ্ছি কিনা তাই দেখবে। এ-দেশে ট্রেনে মালপত্র রাখার ব্যবস্থায় একটু অভিনবত্ব আছে, আমাদের মতো নয়। আমরা সিটের নীচে মালপত্র রাখি, রাতে শোওয়ার আগে চোরের ভয়ে মজবুত লোহার শিকল দিয়ে জড়িয়ে সিটের পায়ার সঙ্গে তালাচাবি দিয়ে বেঁধে রাখি। এখানে ব্যবস্থাটা অন্যরকম। মালপত্র রাখতে হলে সিটটাকে উঁচু করে ধরতে হবে। সিটের নীচে ঠিক সিটের সমান মাপেরই একটা লম্বা বাক্স থাকে। ঠিক যেন একটা সিন্দুক। সিন্দুকের মধ্যে যত খুশি মালপত্র ঢুকিয়ে ঢাকনা নামিয়ে দিয়ে ঢাকনার ওপর শুয়ে পড়লে একেবারে নিশ্চিন্তে সারারাত ঘুমিয়ে কাটানো যাবে। এমন ব্যবস্থা আমাদের দেশে কেন হয় না বুঝি না।

তল্লাশির জন্য সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিন্দুকের ঢাকনা খুলে দিতে হল। এরপর এল অভিবাসন দপ্তরের লোক। পাসপোর্ট দেখে সই করে চলে গেল। তৃতীয় দফায় এল এক মহিলা। তার হাতে টর্চের মতো দেখতে কিছু একটা যন্ত্র। 'সোজা হয়ে বসুন' বলে টর্চটা আমার কপালে ঠেকাল। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। পিস্তল-টিস্তল নাকি। রেলকর্মীর ছদ্মবেশে ডাকাত? কপালে ঠেকাতেই যন্ত্রটায় পিঁ পিঁ করে শব্দ শুরু হল। কী দেখল কী জানি। ওদের দেশের কিছু বিদ্যাবুদ্ধি মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি কিনা, তাই দেখল হয়তো।

তল্লাশির কাজ শেষ হতে শুরু হল ট্রেন মেরামতির কাজ। অনেক রাত পর্যন্ত চলল ঠুক-ঠাক, ঢং ঢং, খট্ খট্ আওয়াজ।

রাত ১টায় ট্রেন ঢুকল মঙ্গোলিয়ার সীমানায়। আরেক দফা খানাতল্লাশি হল। এবার চেঙ্গিস খানের দেশের লোকেরা। এরপর আরামে ঘুমিয়ে কাটল বাকি রাতটা।

সকাল নটা। ট্রেন থেমেছে এক ছোট্ট স্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে মঙ্গোলিয়ার মাটিতে পা রাখলাম। অনেকেই নেমেছে। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটতে ছুটতে এল। ঘিরে ধরল ট্রেনের যাত্রীদের। সবার হাতে একটা দুটো করে জলের বোতল। জল ছাড়া আর কোনও সম্ভার নেই ওদের। বাচ্চাগুলোর চেহারায় পোশাকে দারিদ্রের ছাপ প্রকট হয়ে উঠেছে। মঙ্গোলিয়ার টাকা হল তুগরোক। যাত্রীরা তুগরোক পাবে কোথায়, সবার কাছেই ডলার আর কিছু উয়ান, যা পেইচিং-এ খরচ হয়নি। সকলেই উয়ান খরচ করবার একটা সুযোগ পেল। অনেকেই জল কিনল। ইজরায়েলি যুবক ইয়োসি, আমার সহযাত্রী, দশ উয়ান দিয়ে একটা বোতল কিনল। আমি পাঁচ উয়ানের একটা নোট দেখালাম। দুটি মেয়ে ফিস ফিস করে কী যেন পরামর্শ করল। তারপর পাঁচ উয়ানেই দিয়ে দিল একটা বড় বোতল।

ট্রেন চলেছে মালভূমির মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে। কখনও চড়াই কখনও উতরাই, আঁকাবাঁকা পথে চলেছে ট্রেন। একটা বাড়িকে পিছনে ফেলে ট্রেন এগিয়ে গেল। বেশ কিছুটা সময় পরে সেই বাড়িটাই আবার সামনে এসে পড়ছে। কীরকম হল ব্যাপারটা! একটু ধন্দে পড়ে গেলাম। একই নক্সার অনেক বাড়ি আছে নাকি এখানে! ভালো করে নজর রাখি ট্রেনের গতিপথের দিকে। না, তা তো নয়। চিহ্ন করে রেখেছি একটা বাড়িকে। ঘুরে ফিরে ঠিক ওই বাড়িটাই আবার সামনে এসে পড়ল। ভারি মজার

ব্যাপার। অনেকক্ষণ মনঃসংযোগ করে নিরীক্ষা করে ধন্দ ঘুচল। রেলপথের বাঁকগুলো ঘোড়ার খুরের মতো গোল, মুখটা সরু। একটা বাঁকের ঠিক মুখে যখন ট্রেনটা তখন দেখছি একটা বাড়ি আমাদের বাঁহাতে। এরপর পুরো গোলটা ঘুরে ট্রেনটা যখন এই বাঁকটা থেকে অন্য একটা বাঁকে ঢুকবে তখন সেই বাড়িটাকেই দেখছি আমাদের ডানদিকে। এমনি করে গোল পথে ঘুরতে ঘুরতে চড়াইপথে উঠতে থাকি ওপরদিকে। আবার উতরাইয়ে নেমে যাই অনেক নীচে। উতরাইয়ে ট্রেনের জানলা দিয়ে পুরো মালভূমিটা দেখা যায়। ছোট ছোট জনবসতি। লাল রঙের দুচালা ছোট ছোট বাড়ি। ধূসর অনাবাদি জমি। যেন রঙিন খড়িমাটি দিয়ে আঁকা ছবি। এমন করে ড্রাগনের চেহারার মতো বাঁকাপথে ট্রেন এগিয়ে চলল উলানবাতরের দিকে।

বেলা দুটোয় ট্রেন থামল উলানবাতর স্টেশনে। ট্রেন থেকে নামার সময় ইয়োসি আমাকে একটা বই দিয়ে বলল, 'এই বইটা আপনি রেখে দিন, পড়বেন। খুব সুন্দর বই।'

আমি বললাম, 'উপহার দিচ্ছ যখন তোমার নাম সই করে দাও।'

ইয়োসি নাম সই করল।

দুজনেই নামলাম। ইয়োসি এগিয়ে গেল। আমি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ মানুষদের মুখের দিকে লক্ষ রেখে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলাম, যদি আমাকে কেউ নিতে এসে থাকে।

এ শহরের এক পর্যটন কোম্পানির মালিক পুরভসুরেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল বৈদ্যুতিন ডাকে। মঙ্গোলিয়া ভ্রমণের সব ব্যবস্থা করবার কথা তার।

ছোট্ট স্টেশন, সাধারণ মানের। ছোট ছোট দোকান। তারই মধ্যে একটা বিনিময় ব্যাঙ্ক। পকেটে যা উয়ান ছিল সব বের করে তুগরোক সংগ্রহ করে নিলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝলাম আমার সন্ধানে কেউ এখানে আসেনি। পকেট থেকে বের করলাম সযত্নে রেখে দেওয়া এক টুকরো কাগজ।

'হ্যালো! হুলান! লাসায় পোতালা রাজপ্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম একসঙ্গে, মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো করেই মনে আছে। আঙ্কেল এসেছ? ঠিক আছে, গেটের কাছে অপেক্ষা কর। আমি দশ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।'

মঙ্গোলীয় মেয়ে হুলান হায়ানগার্ভা। মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল লাসা। একই হোটেলে ছিলাম আমরা। আমি উলানবাতর যাব শুনেই সে নিজের ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে বলেছিল, স্টেশনে পৌঁছে ফোন করবে, আমি চলে আসব।

দশ মিনিটের মধ্যেই এসে গেল হুলান। গাড়ি নিয়ে এসেছে। আমার সুটকেস আর লাঞ্চ ব্যাগটা গাড়িতে তুলে নিয়ে বলল, 'কোথায় যাবে বল।'

বললাম, 'এখানে আমার কিছুই জানা নেই। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।'

হুলান বলল, 'আমার ফ্ল্যাটটা ভীষণ ছোট, জায়গা হবে না। একটা গেস্টহাউসে নিয়ে যাচ্ছি, কেমন?'

'বেশ তো, তাই চল।'

'মঙ্গোলিয়ান ওয়ে গেস্টহাউস'। তিনতলায় উঠে দেখি ইয়োসি দাঁড়িয়ে আছে।

'আরে! তুমি এখানে?'

'আমি তো এখানেই থাকব ঠিক করেছি।'

'বাঃ! ভালোই হল। একসঙ্গে থাকা যাবে।'

হুলান অভ্যর্থনা টেবিলে কথা বলে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'পাঁচ ডলারের ঘর নেবে, না সাত ডলারের নেবে'?

পাঁচ ডলারে হোটেলে ঘর পাওয়া যায়! কী আশ্চর্য! বিশ্ব ভ্রমণ প্রায় শেষ হতে চলল। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাইনি তো আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটায় কী ব্যবস্থা?'

অভ্যর্থনা টেবিলের মেয়েটি বলল, 'সাত ডলারে নিজে একা থাকতে পারবেন, আর পাঁচ ডলারে ডর্মিটরি, তিনজন থাকবেন।'

'বাথ টয়লেটের ব্যবস্থা?'

'বাথ টয়লেট সবসময়ই কমন। ছেলেদের জন্য একটা, মেয়েদের জন্য একটা।'

বললাম, 'পাঁচ ডলারের ঘরই নেব।'

ইয়োসির সঙ্গে একই ঘরে ব্যবস্থা হল। লম্বা দরদালান দিয়ে সোজা গিয়ে একেবারে শেষপ্রান্তের ঘরটা আমাদের। মস্ত বড় ঘর। দুপাশে দুটো খাট, একটা টেবিল। মেঝেতে মাদুর পেতে তার ওপর স্পঞ্জের গদি পেতে আরেকটা বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। আরও বেশ খানিকটা জায়গা খালি পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে আরেকটা বিছানা পাতা যায়। ঘরে আর কোনও আসবাবপত্র নেই। সুটকেস আর লাঞ্চ ব্যাগ খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিলাম। দেওয়ালে গোটা দুই পেরেক পাওয়া গেল। তার একটায় পাঞ্জাবি আর পায়জামা লটকে দেওয়া গেল। আরেকটা খালি রাখতে হল ইয়োসির জন্য। তবে তৃতীয় কোনও দাবিদার এলে তাকে আর পেরেকের ভাগ দেওয়া যাবে না।

ঘরের সামনাসামনি শৌচালয়ে দুটো কমোড, তার একটা অচল। যেটা সচল সেটা কাজ চালাবার মতো পরিষ্কার। পাশে মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা। সেটা বেশ ভালো। স্নানঘরটা ভালো মানতেই হবে। ঢের হয়েছে। পাঁচ ডলারে আর কত ভালো চাই?

স্নান সেরে লাঞ্চ ব্যাগ খুলে বসলাম। চাল ভাজা, চিঁড়ে ভাজা, চানাচুর, বিস্কুট আর নিমকি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

পথের দুপাশে চওড়া চলার পথ। ছোট ছোট দোকান, উনুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে। পথ চলতে চলতে নজরে পড়ে, হাতে একটা টেলিফোনের রিসিভার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশকিছু ছেলেমেয়ে। কোনও তার সংযোগ নেই, খেলনা টেলিফোন? ব্যাপারটা বুঝতে বেশ সময় লাগল। তারবিহীন টেলিফোন ওগুলো। আমাদের মতো কর্ডলেস লম্বা টেলিফোন নয়, চৌকো, যেমন হয় আর কি! কোনও বুথ নেই। চলমান বুথ, ঘরভাড়া লাগছে না, আলো-পাখার খরচ নেই, চেয়ার-টেবিলের খরচ নেই। নিখরচায় ব্যবসা। এই গরিব দেশের এটাই অভিনবত্ব, একেবারে নিজস্ব।

চলতে চলতে পেলাম এক বিভাগীয় বিপণি। ভেতরে ঢুকলাম। খাদ্য, পানীয়, ফল আর মাংসের বিপুল আয়োজন। খুবই সস্তা।

চিনের মতো মঙ্গোলিয়াতেও খাবার খরচ খুব কম। একটা বড় রুটি ৩৫০ তুগরোক, মানে এক টাকার মতো (১,২০০ তুগরোক = ১ ডলার)। পেইচিংয়ে সস্তার খাবার প্রাণভরে কিনে খেয়েছি। এখানেও কিনে খাওয়া যাবে। লাঞ্চ ব্যাগ আর খালি হবে না। জমুক না কিছু খাবার। কোরিয়া সস্তার দেশ নয়। সেখানে খরচ হবে। দুবেলার মতো খাবার আর জল কিনে বেরিয়ে এলাম।

চলতে চলতে পেলাম এক পর্যটন কোম্পানির অফিস। অনুসন্ধান করে জানা গেল— শহরটা খুবই ছোট, তাই শহর ভ্রমণের কোনও ব্যবস্থা নেই। যা কিছু দর্শনীয় আছে সবই শহরের বাইরে, অনেক দূরে। পরিবহণ ব্যয় অনেক। যেতে হলে আমাকেই দল যোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে।

চলমান বুথ থেকে হুলানকে ফোন করলাম।

'হ্যালো হুলান, বেড়ানোর কোনও ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।'

হুলান বলল, 'আঙ্কেল, আমি জাপানি ভাষা শিখছি। তাই খুব ব্যস্ত আছি, আমি নিজে তোমাকে নিয়ে বেরোতে পারছি না। ঠিক আছে কাল যা হোক ব্যবস্থা করব। দুপুরে আমি যাব। তৈরি থাকবে।'

পরদিন দুপুরে হুলান এল। বলল, 'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও চট করে।'

'তারপর?'

'গেস্টহাউসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে চল। তোমার বেড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

ঘরভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হুলান জানিয়ে দিল, দুদিন পরে আসব, ঘর যেন থাকে।

হুলান গাড়ি নিয়ে এসেছে। দশ মিনিট পরে যেখানে নামলাম, সেটা ওদের দোকান।

শেষ পর্যন্ত দোকানে আমার থাকার ব্যবস্থা হবে নাকি! হলেই বা, আপত্তি কি।

ওষুধের দোকান। বেশ বড় দোকান। দোতলায় অফিসঘর, বসার ঘর আছে। আমরা দোতলায় গিয়ে বসলাম।

হুলান বলল, 'এটা আমার ভাইয়ের দোকান। কাছেই আরেকটা দোকান আছে আমার মায়ের। মা আর ভাই এখন আছে তেরেলজ ন্যাশনাল পার্কে, শহরের বাইরে অনেক দূরে। পাহাড়ি জায়গা, পুরো গ্রাম। কোনও বাড়ি-ঘর নেই, সবাই তাঁবুতে থাকে। তুমি ওখানে চলে যাও, দুদিন থেকে এস। খুব ভালো লাগবে। মায়ের সঙ্গেই ফিরে আসবে'।

গ্রাম, পাহাড়, তাঁবুতে বাস। আমার মন উড়ে গেল অচিন এক গ্রাম্য পাহাড়ি দেশে।

'কী পছন্দ তো?'

'নিশ্চয়ই। কীভাবে যাব বল।'

হুলান ফোন তুলে নিল। কথা বলল মঙ্গোলীয় ভাষায়। পাঁচ মিনিট ধরে কার সঙ্গে কী যেন কথা হল।

ফোন নামিয়ে রেখে বলল, 'মাকে বললাম তুমি এখুনি যাচ্ছ। তুমি যাবে শুনে মা খুব খুশি। ওখানে আমার এক ভাই আর তিন মাসতুতো ভাইবোনেরা আছে। ওরা

তোমাকে সব দেখাবে। খুব ভালো লাগবে তোমার। আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

হুলান আবার ফোন তুলে নিল। কথা সেরে ফোন রেখে বলল, 'চল নীচে। এখুনি ট্যাক্সি এসে যাবে।'

তরতর করে ওর পিছু পিছু নেমে এলাম। হুলান এবার নির্দেশ দিল, 'সুটকেসটা এখানে থাক। ব্যাগের মধ্যে দুদিনের জন্য যা যা দরকার নিয়ে নাও।'

আমি পেস্ট, ব্রাশ, ক্ষৌরের সরঞ্জাম, সাবান, গামছা আর একটা পায়জামা নিয়ে নিলাম।

হুলান বলল, 'গরম জামাকাপড় কিছু নেবে না?'

'দরকার হবে না। ভেবেছিলাম তোমাদের দেশে খুব শীত হবে। এখন দেখছি মোটেই শীত নেই।'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। হুলান বলল, 'উঠে পড়। কোনও ভয় নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার পরিচিত। মায়ের তাঁবুতে তোমাকে পৌঁছে দেবে। ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিও।'

বিকেল সাতটা। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে চারদিক। শহর পার হয়ে ট্যাক্সি ছুটল গ্রামের পথ ধরে। পথের দুধারে পাহাড়। সবুজ তৃণভূমি পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় গাছের সারি। কাচের ভেতর দিয়ে সোজা সামনের দিকে দেখা যায়, পথটা সোজা পাহাড়ের কোলে গিয়ে থেমে গেছে। গাড়ি চলার আর কোনও পথ নেই। গাড়ি যত ছোটে পথও তত এগিয়ে চলে। পাহাড় নাগালের বাইরেই থেকে যায়। পাহাড়ের পদপ্রান্তে সবুজ তৃণভূমি, চূড়ায় পর্ণমোচী বৃক্ষরাজি, গায়ে গুল্ম-শ্যাওলার আস্তরণ। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ভেলা ভেসে ভেসে ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের কোলে হেলান দিয়ে আছে।

এক সময় সোজাপথ বাঁক নেয়। ট্যাক্সি ওপর দিকে উঠতে থাকে সর্পিল গতিতে। চড়াই উতরাই করতে করতে উঠে যাই অনেক উঁচুতে, আবার নামতে নামতে নেমে যাই দুই শৃঙ্গের মাঝে উপত্যকায়।

লোকালয় আর দেখা যায় না। দুপাশের পাহাড়ের মাঝে ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসছে। লাল পাথুরে পথ এক সময় গিরিপথের আকার নেয়। দুধারে খাড়াই পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কোনও এক স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করছি বোধহয়।

চেঙ্গিস খাঁ কি এই পথেই ভারত আক্রমণ করেছিল! কী জানি।

গিরিপথ অতিক্রম করে আবার চলেছি উপত্যকার পথ ধরে। অনেক দূরে পাহাড়ের কোলে দেখা যাচ্ছে সাদা সাদা গোলাকৃতি তাঁবুর মতো কিছু একটা।

'ওটা কী দেখা যাচ্ছে, ড্রাইভার?'

'ওর নাম গের। পাহাড়ি মানুষেরা ওর মধ্যে থাকে।'

সন্ধে ৯টা বাজে। বেলা শেষ হয়ে এসেছে। ফুলের মতো নরম রোদ্দুর যাই যাই করতে করতে চলেই গেল। দুধের মতো সাদা গেরগুলো আবছা হয়ে এসেছে। দুয়েকজন গ্রামবাসী ঘোড়ায় চড়ে গরু ছাগলের পাল তাড়িয়ে চলেছে গেরের দিকে।

লাল পাথরের পথ ছেড়ে ট্যাক্সি চড়াই পথে অনেকটা ওপরে উঠে এক গেরের সামনে থামল। ড্রাইভার নেমে এগিয়ে গেল তাঁবু পর্যন্ত। তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে

এলেন এক মহিলা। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন ট্যাক্সির দিকে। আমি ট্যাক্সি থেকে নামলাম। তিনি দুহাতে আমার দুটো হাত ধরে রুশ ভাষায় সম্বোধন করলেন, 'কাক্ জিয়েলা (কেমন আছেন)?'

অন্ধকারে চেনার চেষ্টা করে রুশ ভাষাতেই জবাব দিলাম, 'খারাশো, স্পাসিবা নিয়েবেস্তকা (ভালো আছি দিদি, ধন্যবাদ)।'

এইতো সেই মুখ। লাসায় পরিচয় হয়েছিল। হুলানের মা। এখন থেকে আমার দিদি, নিয়েবেস্তকা।

মঙ্গোলিয়া রাশিয়ার গায়ে লাগানো দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব যখন ছিল তখন মঙ্গোলিয়াকে বলা হত সোভিয়েত আশ্রিত দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য মঙ্গোলিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অলিখিত ষোড়শ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। মঙ্গোলিয়ার অধিকাংশ মানুষ রুশ ভাষা জানে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিদায় জানালাম। দিদি আমাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেলেন। অন্ধকার হয়ে গেছে, তাতেও তাঁবুর সাদা রং বেশ বোঝা যাচ্ছে। ছোট্ট দরজা দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে ভেতরে ঢুকতে হল। বড় পরিসরের তাঁবু, গের। গোল তাঁবুর চারপাশে গোল করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পাঁচখানা খাট— একটা বড়, দুজন শোওয়া যায়, আর চারটে ছোট ছোট, একজন করে শোওয়া যায়। ঘরের মাঝখানে তাঁবু গরম রাখার চুল্লি। লম্বা চিমনিটা ওপর দিকে উঠে গেছে। সবকটা খাটের ওপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। চুল্লির পাশে একটা টেবিল, তাকে ঘিরে গোটা কয়েক টুল। টেবিলের ওপর ঝোড়া, কৌটা জাতীয় কিছু গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। দরজার পাশে একটা ছোট জলের বেসিন। সব মিলিয়ে তাঁবু সজ্জায় কোথাও এতটুকু ছন্দপতন ঘটেনি।

বাইরে যেমন ঠান্ডা, ভেতরটা তেমন নয়। বেশ আরাম লাগছে। দিদি চুল্লিতে কাঠ ঠেলে দিতে দিতে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা কাঠ আনতে গেছে, এখুনি এসে পড়বে।'

বলতে বলতেই তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে কাঠের বান্ডিল নিয়ে ভেতরে ঢুকল। দিদি বললেন, 'এই আমার ছেলে গারিন, এই জিদান, এই চান্দান আমার বোনের ছেলে, আর এই বুলগা আমার বোনের মেয়ে।'

নির্দেশ পেয়েই চার ভাই-বোন কাজে লেগে পড়ল। রুটি, চিজ, মাখন, মাংস, ফল মিষ্টি একে একে টেবিলের ওপর রাখল। একটা ছোট ঝোড়ায় রুটি কেটে কেটে রাখছিল জিদান, আর তাতে মাখন মাখিয়ে আরেকটা ঝোড়ায় রাখছিল বুলগা। গারিন চান্দানকে কখনও চিমটি কাটছে, কখনও কাতুকুতু দিচ্ছে। চান্দানের সদা হাস্যমুখ, স্থূল দেহটা নিয়ে লাফালাফি করছে। দুই ভাইয়ে খুব ভাব। চুল্লিকে পিছনে রেখে একটা করে টুল নিয়ে টেবিল ঘিরে বসা হল।

দিদি আমাকে বললেন, 'চা খাবে, না কফি?'

আমি একটু সমস্যায় পড়লাম, কী উত্তর দেব। চা, কফি কোনওটাতেই যে আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু একেবারে না বলাটা সঙ্গত হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, 'দুটোই চলবে।'

দিদি এক কাপ চা আমাকে দিলেন। মঙ্গোলিয়ার চা। চিনের মতো, শুধু লিকার। চায়ের স্বাদ জানলাম প্রথম এই বৎসর বিদেশ ভ্রমণে এসে। কদিন আগে চিনে প্রথম চা খেয়েছি নিজে তৈরি করে কুয়াং ছুয়ো হোটেলে একদিন, তারপর পেইচিংয়ে ইনতু হোটেলে আরেকদিন। আজ তৃতীয় দিন চা খাচ্ছি। ভালোই লাগছিল। কাপ খালি করে ফেরত দিতে দিদি তাতে আবার লিকার ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিলেন আমার পাশে বসা গারিনের দিকে। গারিন কাপ খালি করে ফেরত দিতে সেটা আবার চলে গেল জিদানের দিকে। এমনি করে পাঁচ হাত ঘুরে কাপটি দিদির হাতে এলো। তিনি এক কাপ খেয়ে আবার আমাকে এক কাপ দিলেন। আপত্তি করলাম না। জলের বিকল্প বিবেচনা করেই খেয়ে নিলাম দু কাপ। এইভাবে একটা কাপ ছ'হাতে বারবার ঘুরল, ধোওয়া হল না একবারও।

এরপর শুরু হল খাওয়া। খাদ্যবস্তু ভরা ঝোড়াগুলো টেবিলের মাঝখানেই আছে। যার যেমন ইচ্ছে তুলে তুলে খাও। খাওয়া শেষে টিসু পেপারে সবাই মুখ মুছে নিল। আমাকেও তাই করতে হল। দরজার পাশে একটা ছোট বেসিন আছে বটে, কিন্তু সেখানে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই।

এবার শোয়ার প্রস্তুতি। সরু সরু কাঠের সিলিংয়ে সবার জামাকাপড় ঝুলছে। আমিও তাই করলাম। বুলগা আমার বিছানায় একটা চাদর পেতে দিল। একটা কম্বল, তার ওপর একটা সিল্কের চাদর, তার ওপর একটা লেপ সাজিয়ে দিল। দিদি জিজ্ঞেস করলেন আরও কিছু দরকার হবে কি না।

আরও কিছু! না জানি কত শীত এখানে। মনে দ্বিধা রেখেই বললাম, 'না'।

রাতে আমার একটা সমস্যা আছে— বার দুই তিনবার উঠতে হয় জল যোগ-বিয়োগের জন্য। সঙ্গে যে জলের বোতলটি এনেছি সেটি অর্ধেক খালি। এটাই আমার রাতের সম্বল। খাটের নীচে এমনভাবে রাখলাম যাতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। জলযোগের সমস্যাটা মেটানো গেল, বিয়োগের জন্য যেতে হবে তাঁবুর বাইরে। গভীর রাতে বাইরে যাওয়া চলবে কিনা, কোনও জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে কিনা, কী রকম শীত, এইসব ভাবতে ভাবতে আমার কাশ্মীরী শালটা ভাঁজ করে বালিশের পাশে রেখে শুয়ে পড়লাম। দিদি চুল্লিতে বেশি করে কাঠ ঢুকিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

রাতে একবার উঠতে হল। তাঁবু একেবারে অন্ধকার নয়। বাইরের মার্কারি ল্যাম্পের ছিটেফোঁটা আলোয় আলো-আঁধারি ভাব হয়েছে। চুল্লির কাঠগুলো তখনও ধুক্‌ধুক্ করে জ্বলছে। ভেতরে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। বাইরে শীতের তীব্রতা যতটা আশঙ্কা করেছিলাম তার থেকে অনেক কম। কাশ্মীরী শালেই কাজ হল।

অভ্যাস মতো আমার ঘুম ভাঙল খুব সকালে। তখনও কেউ ওঠেনি। প্রাতঃক্রিয়াদির কীরকম ব্যবস্থা জানা নেই। তাই শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। দিদি উঠলেন। তখন আটটা বাজে। সবে প্রত্যুষকাল। রোদ উঠতে আরও কিছু বাকি। একটু পরেই গারিন বাইরে এলো। জিজ্ঞেস করলাম টয়লেট কোথায়। গারিন দেখিয়ে দিল সামনের দিকে।

তাঁবু থেকে একশো গজ দূরে হবে। ধরেই নিয়েছিলাম চিনের মতো এদেশে

জলশৌচের প্রথা নেই। সেইমতো তৈরি হয়ে এসেছিলাম। ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের ছোট বোতলটা বের করে তাতে জল ভরে পকেটে ছোট্ট সাবানের কেসটা ঢুকিয়ে সবার আড়ালে এগিয়ে চললাম কাঠের ঘরের দিকে।

পাশাপাশি দুটো দরজা। একটাতে ঢুকলাম। কাঠের পাঠাতন। মাঝখানে গোল গর্ত। গর্তের দুপাশে পা রেখে বসতে হবে। বসার জন্য পাদানি নেই। কোনও দিনতো জল পড়ে না। নৈকষ্য পূরীষের গন্ধে ভুড় ভুড় করছে। উপায় কী? কোনওরকমে কাজ সেরে বেরিয়ে এসে স্বস্তি পাই। জলের অভাবে ক্ষৌরকর্ম স্থগিত রাখলাম। গারিনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম স্নানের কোনও ব্যবস্থা নেই। অতএব ওই কাজটিও মুলতুবি রইল।

প্রাতরাশের আয়োজন হল দশটায়। কাল রাতের মতোই ব্যবস্থা। একই কাপে সবার চা খাওয়া। তারপর একই পাত্র থেকে তুলে তুলে খাওয়া, দুরকম রুটি, মাখন, চিজ, ফল, মিষ্টি।

খাওয়া শেষে গারিন বলল, 'আমরা ঘোড়া নিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

তিন ভাই চলে গেল। বুলগা বলল, 'চল আঙ্কেল, আমরা বেড়িয়ে আসি।'

ঠান্ডা বেশ আছে, তবে ভীষণ নয়। ধুতির সঙ্গে গরম পাঞ্জাবি। তাই অনেক। কাশ্মীরী শালটা ভাঁজ করে গলায় এক পাক জড়িয়ে দু পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছি। পায়ে কাবলি জুতো, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ।

ফুলের মতো নরম রোদ। শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে নেমে চলেছি চড়াই থেকে উতরাইয়ের দিকে। বাঁপাশে বুলগা, অষ্টাদশী, ঋজু সুঠাম দেহ। দৃপ্ত চলার ভঙ্গী। কখনও রুশ ভাষায় কখনও ইংরিজিতে কথা হচ্ছে দুজনায়। তাঁবুর সীমানা পার হয়ে অনেকটা নেমে এসে দাঁড়ালাম। নরম ঘাসের ওপর দিয়ে দৃষ্টি গড়িয়ে দিলে সে দৃষ্টি গড়াতে গড়াতে অনেক নীচে উপত্যকার সমভূমিতে গিয়ে আটকে যায়। সেখানে আট-দশটা গের। দুটো ঘোড়া বাঁধা আছে। একজন ঘোড়ায় জোত দিচ্ছে।

ডানদিকে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। দিগন্তবিস্তৃত সেই শৈলচূড়ার যেন শেষ নেই। বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ পাইন, ফার, বার্চের চূড়াগুলি সোজা ওপর দিকে উঠে গেছে। যেন নীল আকাশটাকে ছুঁতে চায়। উত্তরে অনেক দূরে বনভূমির আড়াল থেকে ছোট্ট এক নদী রূপালি নুপূরে ছন্দ তুলে উপল থেকে উপলে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে চলেছে দক্ষিণের দিকে।

এগিয়ে চললাম ওইদিকে। এখানে চলার পথ বেশি অবনত। বুলগা আমার ডানহাত শক্ত করে ধরে আছে পাছে পড়ে যাই।

নদীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল দু গণ্ডূষ ভরে তুলে নিয়ে মুখে ছেটাই, মাথায় দিই। শালটা একটু ভিজে গেল। একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। স্রোতের টান বড় কম নয়। ঘোড়া টাল সামলে ধীরে ধীরে পা ফেলছে। দুয়েকজন মানুষ পায়ে হেঁটেও পারাপার করছে। একজন কাঁধের ওপর সাইকেলটা তুলে নিয়েছে।

জলের কিনারা দিয়ে হেঁটে চলেছি। বুলগা আমার পাশে পাশে হাত ধরে চলেছে। একদল মেয়ে পাইন-ফারের বনে বনভোজনের আয়োজন করছে। উনুন বানিয়েছে।

কেউ রান্না করছে, কেউ বন থেকে কাঠ আনছে। কোনও তফাৎ নেই আমাদের সঙ্গে। হঠাৎ ওরা হাস্যকলরোলে মুখর হয়ে দল বেঁধে ধাওয়া করল আমাদের দিকে। কী ব্যাপার বুঝতে পারি না। আমাকে ঘিরে ধরল সবাই।

'আপনার সঙ্গে আমরা ছবি তুলব।'

এই ব্যাপার। 'বেশ তো। তোল না।'

সম্মতি জানালাম। হুড়োহুড়ি লেগে গেল দাঁড়ানোর জন্য। আমার বাঁপাশে বুলগা। ডানপাশে কে দাঁড়াবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি ওদের মধ্যে। সবাই আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াতে চায়। ওদের দেখে যে দুটি মেয়ে রান্না করছিল তারাও দৌড়ে এলো। এবার সমস্যা— কে ছবি তুলবে। বুলগা আমার পাশ ছাড়বে না। ওদের মধ্যে যার ক্যামেরা সে অন্যকে বলছে ছবি তুলতে। কিন্তু কেউ ক্যামেরা হাতে নিতে চায় না। নিজে বাদ পড়ে যাবে যে। ভারি মজার ব্যাপার। শেষে একজন রাজি হল এই শর্তে, যে পরে সে এসে আমার পাশে দাঁড়াবে, অন্য কেউ ছবি তুলবে।

ছবি তোলার পরও মেয়েরা আমাকে দেখছে। বুঝতে পারছি, ওরা আমাকে দেখছে না, দেখছে আমার ধুতি আর পাঞ্জাবিকে।

আমরা দুজন আবার এগিয়ে চললাম নদীর কিনারা ধরে। বুলগা আমার বাঁহাত ধরে চলেছে। অন্য এক পিকনিক দলের তিন-চারটি ছেলে পাতলা চ্যাপটা আকারের পাথর সংগ্রহ করছে। ওই দিয়ে ওরা ব্যাঙ বাজি খেলছে। চ্যাপটা পাথর কায়দা করে ছুড়তে পারলে জলে ধাক্কা খেতে খেতে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে অনেকটা দূর পর্যন্ত চলে যায়। কার ব্যাঙ কত দূর যায় এ খেলায় তারই প্রতিযোগিতা।

কতগুলো পাখি বসেছিল একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর। দোয়েলের মতো, আকারে বড়। ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। দিল না তুলতে। উড়ে গেল। ওদের শান্তি ভঙ্গ হল বোধহয়। দুজন লোক মাছ ধরছে বঁড়শি দিয়ে।

এখান থেকে নদীটা ডাইনে বাঁক নিয়ে ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। আর উপল বিছানো বালুচর নেই।

বুলগা বলল, 'চলো, এবার আমরা ফিরে যাই।'

উল্টো পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এলাম। চান্দান আর গারিন এল ঘোড়ায় চড়ে। চান্দানের পিছনে আরেকটা ঘোড়া, কোনও সওয়ার নেই। লাগাম ধরে আছে চান্দান। গারিনের হাতে একটা বড় কেটলি। সে নামল না, নদী পার হয়ে চলে গেল ওপারে। চান্দান ঘোড়া থেকে নামল। দুটো ঘোড়ার মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে তার ঘাড়ে দুটো চাপড় মেরে আমাকে বলল, 'আপনি এটায় উঠুন। এটা খুব শান্ত।'

বলে কী! আমি ঘোড়ায় উঠব! তারপর নদীতে নামতে বলবে? বেশ ভয় ভয় করছে। তবু আপত্তি করলাম না। শাল আর ব্যাগ বুলগার হাতে দিয়ে উঠলাম ঘোড়ার পিঠে। একেবারে নিজের চেষ্টায় পারি না। চান্দান সাহায্য করল। বাঁহাতে লাগাম আর ডানহাতে ছপটি ধরিয়ে দিল। ঘোড়াকে কীভাবে চালাতে হয়, থামাতে হয়, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে হয়, সব বুঝিয়ে দিল আমাকে। চান্দান ঘোড়ায় উঠল। আমার ঘোড়ার লম্বা লাগামের শেষ প্রান্তটা চান্দান ধরে রইল। ওর ঘোড়া নদীতে নামল। আমার ঘোড়া চলল পিছেপিছে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ঘোড়া হাঁটুজলে

নেমেছে। অসম নদীতল, কোথাও উঁচু পাথর, কোথাও গর্ত। স্রোতে বেশ তেজ এখানে। একেবারে সোজা যেতে পারছে না ঘোড়া, স্রোত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ডানদিকে। নীচের দিকে তাকাতেই ভয় লাগছে। শক্ত মুঠোয় লাগাম ধরে সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছি যাতে জলের দিকে দৃষ্টি না পড়ে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, যদি ঘোড়া টাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে পড়ে, তখন লাগাম আমায় রক্ষা করতে পারবে না। নদীতে ডুবে যাওয়ার মতো জল নেই। কিন্তু এক বস্ত্রে এসেছি এখানে। আমার মনের অবস্থাটা ভাবুন একবার। এখন নদীর মাঝখানে। ভয়ে চান্দানকে বলব ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে, তাতে বিপদ আরও বেশি। নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ। কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

নদী পেরিয়ে এলাম। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। দেহটাকে শিথিল করলাম। নদীর তীর থেকে মূল ভূখণ্ড বেশ উঁচুতে। ঘোড়া সামনের পা দুটো ওপরে তুলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমি প্রায় চিত হয়ে পড়ে যাই আর কি। কোনওরকমে সামলে নিলাম।

এখন সাহস একটু বেড়েছে। ঘোড়া চলেছে অসম বনপথ দিয়ে নিজের পথ করে। তাকে চালনা করতে আমি পারছি না। তাই কখনও কখনও আমার পা ঘসে যাচ্ছে বড় গাছের কাণ্ডে, কখনওবা হঠাৎ সামনে এসে পড়া গাছের ডাল থেকে মাথা বাঁচাতে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে আমার মাথা ঠেকাতে হচ্ছে।

বন্ধুর বনপথ পার হয়ে সমতল প্রান্তরে এসে পড়লাম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। চারদিকে শুধু ঘাস আর ঘাসফুল। সবুজ ঘাসের ওপর নানা রঙের ঘাসফুল মাথা উঁচু করে মেলে দিয়েছে পাপড়ি, সাদা, নীল, হলুদ। প্রকৃতি আপন খেয়ালে সাজিয়েছে আপনার বাগান।

ঘোড়ার লাগামের টানে সম্বিত ফিরে পাই। লাগামের শেষ প্রান্তটা তো চান্দানের হাতে। ও নিজের ঘোড়ার দু পেটের দুপাশে দু হাঁটু দিয়ে জোরে আঘাত করতেই ওর ঘোড়া ছুটল। সেই সঙ্গে আমারটাও। চান্দানের দেখাদেখি দেহের ঊর্ধ্বাংশ ওপর-নীচ করে ঘোড়ার গতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছি। একটু একটু ভয় করছে। মজাও লাগছে। ভয় মিশ্রিত আনন্দ।

পাহাড়ের দিক থেকে গারিন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ঠিক যেন মানসিংহ কিংবা পৃথ্বিরাজ সাম্রাজ্য জয় করে ফিরছে। চিৎকার করে বলল, 'দুধ কোথাও পাইনি... ই... ই...।' 'নি... ই... ই...' পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ওর দু হাতে দুটো বড় বড় কেটলি। নদীর ওপারে দুধ না পেয়ে এপারে চলে এসেছে।

অনেক দূরে দূরে পাহাড়ের কোলে কোলে একেকটা ছোট ছোট গ্রাম। গ্রাম মানে দুটো-তিনটে করে গের। একেকটি গেরে একেকটি পরিবার বাস করে। একেকটা পরিবারের সদস্য চার থেকে পাঁচজন। প্রত্যেক প্ররিবারের সম্পত্তি হল অনেকগুলো করে ঘোড়া বা ছাগল। এ দেশে প্রত্যেকের গড়ে মাথাপিছু একটি করে ঘোড়া আছে। প্রত্যেক পরিবারের আস্তাবলে ঘোড়া বা ছাগল বাঁধা আছে। আস্তাবল মানে খোলা জায়গায় চারটে করে ছোট ছোট খুঁটি পুঁতে তাতে দড়ি বেঁধে সীমানা চিহ্নিত করা

হয়েছে। বড় চুল্লিতে বিশাল কড়াইতে দুধ ফুটছে। কাঁচা দুধ বিক্রি হয় না, কড়াই থেকে গরম দুধ তুলে খরিদ্দারদের পাত্রে ঢেলে দেয়। দুধ বিক্রিই এদের জীবিকা। এই সময় পর্যটকদের আসার মরসুম, তাই দুধের চাহিদা খুব।

'যেটুকু আছে আমাদের লাগবে, পাশের গ্রামে দেখ।' এমনি করে ফিরিয়ে দিচ্ছে সবাই। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা তিনজন।

এখন সমতল দিয়ে চলেছি। পাহাড় অনেকটা দূরে সরে গেছে। চারদিকে শুধু সবুজ। সবুজে সবুজে চোখ যেন ক্লান্ত। সাত-আটটা গ্রাম ঘুরে শেষে দুধ পাওয়া গেল এক গ্রামে।

দু কেটলি দুধ নিয়ে গারিন সবার আগে। তারপর চান্দান, তারপর আমি। এখন আমার আড়ষ্টতা কেটে গেছে, সহজ হয়ে চলেছি। তবু চান্দানের হাতে আমার ঘোড়ার লাগাম। নদী পার হয়ে আসতে আর ভয় করছে না।

এ পারে নদীর ধারে একটা গাড়ি রাখা আছে। দিদি আর বুলগা নদীর জলে জামাকাপড় কেচে উপল ছড়ানো বালুচরে শুকোতে দিচ্ছে। ওরা দুজনেই পরে আছে অন্তর্বাস। শুধু অন্তর্বাস বলে বোঝানো গেল না। মিনির মিনি তস্য মিনি অন্তর্বাস। পশ্চিম দেশের চলচ্চিত্রেও এই পোশাক ব্যবহার করলে অশ্লীলতার দায় এসে পড়বে। আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি। আমার এখানে থাকা সমীচীন কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আড়াল-আবডাল তো কোথাও নেই। পাহাড়ের কোলে নদীর ধারে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমি একজন নবাগত বিদেশি অতিথি, তাতেও দুই মহিলার কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না, পোশাক পরিবর্তনও হল না।

জিদান একটা গামলা ভর্তি লুচি জাতীয় কিছু একটা খাবার নিয়ে এল। গারিন ঘোড়া তিনটি ফেরত দিতে চলে গেল। এখানে নদীর জলধারা চারদিকে ছড়িয়ে একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো তৈরি হয়েছে। খাবার ভর্তি পাত্রগুলো হাতে হাতে এই দ্বীপের মধ্যে এনে রাখা হল। সবাই পাথরের ওপর গোল হয়ে বসলাম। আমি কাবলি জুতো খুলে রেখে জলের মধ্যে পা ছড়িয়ে দিলাম। সবার মাঝখানে রাখা হল খাবার পাত্রগুলো। দিদি একটা বড় কাপে এক কাপ দুধ আমাকে দিলেন। এ দুধের স্বাদ ঠিক দুধের মতো নয়, ঘোলের মতো লাগছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কীসের দুধ?'

গারিন জবাব দিল, 'ঘোড়ার দুধ।'

দুধটা শেষ করে কাপটা ফেরত দিলাম। ওই কাপটা আবার দুধ ভর্তি হয়ে এল গারিনের হাতে। তারপর সবার শেষে দিদির হাতে এল। তিনিও ওই কাপে দুধ খেলেন। বণ্টনের দ্বিতীয় দফায় আবার ওই কাপেই এক কাপ দুধ এল আমার হাতে। কাপ ধোয়ার জলের অভাব এখানে আদৌ নেই। তাহলে কি সাধারণ স্বাস্থ্যবোধের অভাব? পরে জেনেছি, এটা এদেশের সামাজিক রীতি। সবার সঙ্গে এক পাত্রে আহারে বন্ধুত্বের গভীরতা প্রকাশ পায়।

খাওয়া শেষে গারিন আর চান্দান নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, হুটোপুটি করল অনেক সময় ধরে। গা মুছল না, জাঙিয়া ছাড়ল না। রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে গা শুকল, জাঙিয়া শুকল।

বেলা তিনটে বাজে। জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তোলা হল। দিদি এতক্ষণে একটা

ট্রাউজার পরলেন, গায়ে জামা চাপালেন। বুলগা একটা ট্রাউজার পরেছে, নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা কাঁচুলি বেঁধেছে। ফিরে আসা হল গেরে। গের থেকে সব জিনিসপত্র তুলে উলানবাতর যাত্রা শুরু হল।

গারিন গাড়ি চালাচ্ছে। ওর পাশে আমি বসেছি। পিছনে বসেছে চারজন। যে পথে এসেছিলাম সেই পথে কিছুটা এসে গারিন অন্য পথ ধরল। একটা ছোট্ট পাহাড়ের পাশে গাড়ি থামাল।

পাহাড়টাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন দুটো সমান আকারের পাথরের মাথার ওপর একটা বড় পাথর আলগাভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটু ধাক্কা লাগলেই পড়ে যেতে পারে।

খাড়াই পাহাড়। গারিন আর জিদান তরতর করে উঠে চলেছে। ওদের পিছনে চান্দান আর দিদি। সবার পিছনে আমি। আমার পাশে বুলগা।

রুক্ষ পাহাড়, ঘাস গুল্ম কিছু নেই। মাঝে মাঝে একটা দুটো ছোট ছোট গাছ। এক হাতে ধুতি ধরে অন্য হাতে গাছের ডাল ধরে উঠছি। কাবলি জুতো পায়ে। খুব সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলার ধাপগুলো বেছে নিতে হচ্ছে। বুলগা সাহায্য করছে।

অনেকটা উঠে একটা চূড়ায় এসে সবাই দাঁড়িয়েছি। পর্বতারোহীরা যাকে বলে সামিট, সেইরকম একটা ব্যাপার আর কী। এখন আমাদের মাথার ওপর আলগাভাবে স্থাপন করা বড় পাথরটা ছাদের কাজ করছে। তিনটে পাথরের ছেদ বিন্দুতে একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো ত্রিকোন আকারের ছোট্ট সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়েছে। ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাস যেন একটা মানুষের দেহের প্রস্থের মাপে প্রকৃতি তৈরি করেছে। সরাসরি হেঁটে বা বসে যাওয়া চলবে না। শুয়ে পড়ে দেহটাকে সুরঙ্গের মধ্যে গলিয়ে দিতে হবে। সুরঙ্গ পথে উঁকি দিয়ে দেখা যায় ওপাশে অনেকটা নীচে আরেকটা পাথরের ধাপ। এই সুরঙ্গ পথ দিয়ে ওই ধাপে নামতে হবে— এটাই হল এই পাহাড়ের আকর্ষণ। এই আকর্ষণেই তেরেলজ জাতীয় উদ্যানে যারা আসে তারা এই ছোট্ট পাহাড় অভিযানে আসবেই।

গারিন আর জিদান পা দুটো আগে গলিয়ে দিয়ে ঘসে ঘসে চলে গেল সহজেই। দিদি নেমে গেলেন। বুলগাও নেমে গেল। এবার আমার পালা। কাবলি জুতোজোড়া গুহার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ওদিকে। ব্যাগ আর ক্যামেরা বুলগা ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল। তারপর বসে পড়ে পা দুটো এগিয়ে দিয়ে ঘসে ঘসে শরীরটা একটু একটু করে গলিয়ে দিলাম গুহা পথে। শরীরের অর্ধেকটা চলে গেছে গর্তের ওপাশে। পা দুটো ঝুলছে। পায়ের নীচে মাটি পাচ্ছি না। এদিকে হাত দিয়ে ধরার মতো কিছু নেই। প্রায় ত্রিশঙ্কু অবস্থা। ওপাশ থেকে বুলগা উৎসাহ দিচ্ছে, 'আর একটু... আর একটু... বাঁপাটা আর একটু নামাও... হ্যাঁ, এইবার ডান পাটা ফেলো পাথর পাবে।'

কোথায় পাথর, তখনও আমার পা দুটো ঝুলছে। অনেক চেষ্টা করে পা দুটো আরও একটু নামান গেল। বুলগা ডানপাটা ধরে ডান দিকে বেঁকিয়ে একটা পাথরের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিল। এবার শরীরটা ছেড়ে দিতে সুরসুর করে গড়িয়ে নীচে নেমে এলাম।

পড়ে আছে চান্দান একা। ওর স্থূল দেহটা গর্তে আটকে যাচ্ছে। গারিন চেঁচাচ্ছে, 'মোটা নাম দেখি।'

চান্দানের সঙ্গে গারিন এমন তামাশা সব সময় করছে। আমার তো ভয় করছে, ওর শরীরটা বুঝি গর্তে আটকেই যায়। বোতলের সরু মুখ দিয়ে রবারের বল ঢোকাতে হলে যেমন একটু একটু করে টিপে টিপে ঢোকাতে হয় চান্দান তেমনি করে নিজের শরীরটা একটু একটু করে ঢোকাচ্ছে। যতক্ষণ ও চেষ্টা করল ততক্ষণ গারিন ওকে নিয়ে তামাশা করল, 'মোটা আর পারবি না।'

এটা আরেকটা শৃঙ্গের সামিট বলা যায়। জায়গাটা বেশ সমতল। তিনদিক ঘেরা, একদিক খোলা। ব্যালকনির মতো। ছোট্ট পরিসরের জায়গায় ছজন দাঁড়িয়ে আছি গায়ে গায়ে। ধরবার কিছু নেই। সাবধানে নড়াচড়া করছি।

সামনে ভুবনমোহিনী উপত্যকা। সাগরের ঢেউয়ের মতো, উঠতে উঠতে নেমে যাচ্ছে, আবার নামতে নামতে উঠে যাচ্ছে। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাহাড়বাসীদের চলার পথ, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, শাখায় প্রশাখায় ভাগ হয়ে মোটা থেকে সরু হতে হতে রেখাগুলো বিলীন হয়ে গেছে অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে। দুয়েকজন অশ্বারোহী সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঢেউয়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নিসর্গ অকৃপণ সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে।

দিদি এক জার দুধ আর একটা কাপ এনেছেন। এক কাপ করে দুধ খাওয়া হল। বিশ্রাম হল। এবার ওপরে উঠতে হবে ওই পথেই। উঠতে কোনও কষ্ট হল না, সহজেই চলে এলাম ওপরের সামিটে। প্রকৃতির নিয়মটা এখানে উল্টে গেছে— ওঠা সহজ, নামা কঠিন।

আবার গাড়ি ছুটল। বেশ কিছুটা গিয়ে আবার পথের পাশে একটা ছোট্ট পাহাড়। গারিন গাড়ি থামাল। এটা আরও ছোট পাহাড়। পাহাড়ের পাশে কুঁচো পাথরের স্তূপ। এটা নৈসর্গিক নয়, মানুষের তৈরি। স্তূপের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে একটা মোটা গাছের ডাল পোঁতা। ডালের ডগায় নীল রঙের একফালি কাপড় বাঁধা, পত পত করে উড়ছে। দিদি এগিয়ে গেলেন ওইদিকে। তিনবার পাথরের স্তূপটাকে প্রদক্ষিণ করলেন। তাঁর পিছে পিছে আর সবাই ঘুরল স্তূপটাকে। শুধু বুলগা আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

'এটা কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম। দিদি বললেন, 'এর নাম আব্‌ওয়া। এর সামনে দাঁড়ালেই একে তিনবার প্রদক্ষিণ করতে হবে। এটা আমাদের ধর্মীয় নিয়ম।'

সন্ধ্যে আটটায় পৌঁছলাম দিদির আবাসনে। হুলান নৈশ ভোজের আয়োজন সেরে আমাদের আসার অপেক্ষায় ছিল।

'আঙ্কেল, কেমন লেগেছে তেরেলজ ন্যাশনাল পার্ক?'

'দারুণ ভালো। ওখানে না গেলে এদেশের মানুষের জীবনধারা আমার জানা হত না।'

'কাল কোথায় যাবে আঙ্কেল?'

'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।'

'তাহলে কাল গোবি মরুভূমি চলে যাও। যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই যাব। মঙ্গোলিয়া এসেছি গোবি মরুভূমি দেখব না?'

'ঠিক আছে, এখন খেয়ে নাও, তারপর তোমাকে গেস্টহাউসে পৌঁছে দিয়ে আসছি। কাল সকাল আটটায় তৈরি থাকবে। ভাইকে পাঠিয়ে দেব।'

'তুমি যাবে না?'

'না আঙ্কেল। আমার পড়া আছে। তারপর দোকানটাও দেখাশুনা করতে হয়। আমি যেতে পারব না। সরি আঙ্কেল।'

গেস্টহাউসে বলাই ছিল, আমি আজ ফিরব। আগের ঘরেই ব্যবস্থা হল। ইয়োসি চলে গেছে। অন্য কেউ আসেনি। আজ একাই থাকব।

পরদিন সকাল আটটাতে গারিন এসে গেল। সঙ্গে আছে চান্দান আর দিদি।

শহরের পথ শেষ হতেই বুঝলাম মরুভূমির দিকে এগিয়ে চলেছি। সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। পথের দুধারে উষর প্রান্তর। অনেক দূরে দূরে রুক্ষ পাহাড়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটা গাছ। আর গুল্মের ঝোপ। দুর্গম পথ। তাতে আবার কোথাও কোথাও মেরামতের কাজ চলছে। পথ চলা কঠিন। গারিন গাড়ি থামাল।

কতগুলো উট শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। দু কুঁজওয়ালা উট। কাছে যেতে ওরা উঠে চলে গেল।

বালির পাহাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। পায়ের নীচে পড়ছে বড় বড় ঘাস, গুল্ম। তাতে চলার সুবিধে হচ্ছে, বালির মধ্যে পা ঢুকে যাচ্ছে না। দিদি গুল্মের মধ্য থেকে বেছে বেছে গোটা কয়েক লম্বা লম্বা ঘাস ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে বললেন, 'খেয়ে দেখো তো, কী রকম লাগে।'

পিঁয়াজের মতো স্বাদ।

আবার কিছুটা চলতে চলতে গোটাকয়েক গুল্ম পাতা ছিঁড়ে আমাকে দিলেন। আমি খেতে যাচ্ছিলাম। উনি আমার হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, 'খেও না যেন। এটা খেলে নেশা হবে। মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।'

গারিন আর চান্দান খেলায় মাতলো। একটা বালির ঢিপির ওপর উঠে চান্দান হাত দিয়ে বালি সরিয়ে সরিয়ে মস্ত এক গর্ত তৈরি করল। তারপর গর্তের মধ্যে শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে বালি টেনে টেনে নিজেকে কবর দিল। সম্পূর্ণ দেহটা রইল বালির নীচে, মাথাটা শুধু বাইরে বেরিয়ে আছে। গারিন হাত দিয়ে বালি চেপে দিয়ে তার ওপর কিছু ঘাস, গুল্ম গুঁজে দিল। যেন সমাধিক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

বালির পাহাড় পার হয়ে হয়ে একটা থেকে আরেকটা করতে করতে সব থেকে উঁচু বালিয়াড়ির ওপর উঠলাম। এখন চারদিকে শুধু বালি, আদিগন্ত বালির সাগর।

বেলা গড়িয়ে যায়। বালির সাগরে ধীরে ধীরে ডুব দিল সূর্য। আমরা পশ্চিম থেকে পুবমুখী হলাম।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম এক সংরক্ষিত বনভূমিতে। একটা ছোট্ট সংরক্ষণশালা, প্রহরী বসে আছে। বিজ্ঞপ্তি পর্যটকদের সতর্ক করে দিচ্ছে— বন্যজন্তুদের বিরক্ত করবেন না।

এখান থেকে অনেক দূরে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়। ওই জঙ্গলে বাস করে একজাতীয় জেব্রা। স্থানীয় নাম 'টাখ'। এদের অস্তিত্ব বিপন্ন। গোটা অরণ্যে সর্বসাকুল্যে বেঁচে

আছে মাত্র শ-দুই টাখ। মঙ্গোল সরকার এই বিরল প্রজাতির প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতে সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। সন্ধ্যার পর এরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসে জল খেতে। এদের দেখার জন্য বন্যপ্রাণী-প্রেমী মানুষেরা এই সংরক্ষণশালার কাছে অপেক্ষা করে থাকে। দিদির খুব ইচ্ছে টাখ দেখে বাড়ি ফেরেন।

বনবিভাগের দ্বাররক্ষী বললেন, 'অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন তার নিশ্চয়তা নেই। এরা কখন নামবে তার কোনও ঠিক নেই। কোনও কোনও দিন নামেই না'।

আরও অনেকে এসেছে টাখ দেখার বাসনা নিয়ে। সবাই হতাশ হয়ে ফিরে গেল। আমরা সংগ্রহশালা দেখে অন্য এক তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলাম। সাজানো বাগানের মধ্যে গোটা তিনেক তাঁবু। তার একটায় রেস্টুরেন্ট। রাতের খাওয়া সেরে নিলাম।

রাত আটটা বাজে। ঠিক রাত নয়, বিকেল। বনভূমির মাথার ওপর তখনও রোদ আছে। আমরা এগিয়ে চললাম গাড়ির দিকে।

উলানবাতর পৌঁছতে রাত এগারোটা হল। গারিন আমাকে গেস্টহাউসের সামনে নামিয়ে দিল।

পরদিন সকালে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে শরীর চর্চা সেরে নীচে নেমে দেখি বুলগা প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

'কেমন আছ আঙ্কেল?'

'ভালো আছি। কাল গেলে না কেন?'

'আমার খুব ইচ্ছা ছিল যাওয়ার। কী করব, বাড়িতে অনেক কাজ ছিল। রাগ করেছ?' বুলগা বিষণ্ণ মুখে বলল।

আমি কোনও জবাব দিলাম না। বুলগা আমার ডান হাতটা ওর দু হাতের মধ্যে নিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এই তো এখন এসেছি। চল, তোমার সঙ্গে বেড়াব।'

'কাল গেলে কত ভালো লাগত।'

'রাগ করো না। চলো তোমাকে আমাদের শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব।' বুলগা আরও কাছে টেনে নিল আমাকে।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম এক বুদ্ধ মন্দিরে। ধাতু নির্মিত দণ্ডায়মান বুদ্ধ, খুব লম্বা। মন্দিরের ভেতরে না ঢুকলে সম্পূর্ণ অবয়ব দেখা যায় না।

ছোট্ট শহর উলানবাতর। দর্শনীয় বেশি কিছু নেই। পথে যানবাহনের ব্যস্ততা কম। তবু বুলগা খুব সাবধানী, ন্যাশনাল পার্কে যেমন ছিল। শক্ত করে ধরে আছে আমার হাত। পথ চলতে চলতে বুলগা এক জায়গায় থামল।

'এই দেখ আঙ্কেল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।'

পথের ধারে একটা দোতলা বাড়ি, পুরনো, আয়তনে খুব বড় নয়। ওপরে লেখা 'মঙ্গোলিয়া ইউনিভার্সিটি'। কলকাতার যে কোনও একটি সাধারণ মানের স্কুলের জন্য এই বাড়ি মানানসই। যে কোনও দেশে গেলেই সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় দেখা এবং সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আমার স্বাভাবিক কর্মসূচির মধ্যে থাকে। আজ যেন মনটা মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ে উড়ে যেতে চাইছে। বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাওয়ায় মন সায় দিল না।

আবার থামল বুলগা।

'ওই দেখ, তোমাদের দেশের দোকান।'

সাইন বোর্ডে লেখা 'ইন্ডিয়ান শপ'। সত্যিই সব কিছু ভারতীয়। সালোয়ার, কামিজ, চুড়িদার, শাড়ি, ব্লাউজ, ধাতুনির্মিত মূর্তি, আগরবাতি আরও অনেক কিছু। দোকানের মালিক পশ্চিম ভারতীয়। আট বৎসর হল এ দেশে ব্যবসা করছেন।

দু বোতল ঠান্ডা পানীয় কিনে দুজনে খেতে খেতে আবার চলেছি। চলতে চলতে এসে পৌঁছলাম উলানবাতর রাষ্ট্রীয় সমবায়িকার সামনে। এটাই উলানবাতরের কেন্দ্রস্থল। এখান থেকে হুলানের ওষুধের দোকান দু মিনিটের পথ। পাঁচতলা বাড়ি জুড়ে মস্ত বড় সমবায়িকার বাজার। ঘুরে ঘুরে দেখা হল, দরাদরি হল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি।

'এখন কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

এতক্ষণ বুলগা খুব প্রাণবন্ত ছিল। অনেক কথা বলেছে, শহরের আনাচে কানাচে কত কী দেখিয়েছে, যা দেখার মতো নয় তাও দেখিয়েছে। ক্ষণেকের জন্যও আমার হাত ছাড়েনি। হঠাৎ ওর মুখখানা মলিন হয়ে উঠল। আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে আছে দুহাত দিয়ে। চেয়ে আছে আমার চোখে চোখ রেখে।

'চল, হুলানের দোকানে যাই।'

'তুমি যাও, আমি যাব না।'

'কেন?'

'ওখানে গিয়ে তুমি তো...।' কথা শেষ হয় না, চোখ নত হয়। বুঝতে পারি ওর অব্যক্ত ভাষা।

বুলগার চোখের কোণ দুটো কি চিক্ চিক্ করে উঠল? কি জানি। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। মনে হল একবার ডাকি। পারলাম না। ডাকলেও কি ও সাড়া দেবে? ফিরে আসবে? বোধহয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ওই দিকে চেয়ে। পথের বাঁকে বুলগা অদৃশ্য হয়ে গেল।

হুলান দোকানের অফিস ঘরে বসে পড়াশুনা করছিল। আমাকে দেখেই বইপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ল।

'চল, আঙ্কেল, লাঞ্চ করে আসি।'

এক কোরীয় রেস্টুরেন্টে খাওয়া হল। খাওয়া শেষে ফিরে এলাম ওর দোকানে। আমার সুটকেসটা তিনদিন ধরে পড়ে আছে এখানে। ওটা তুলে নিলাম। কাল এ দেশ ছেড়ে চলে যাব কোরিয়া। হুলান গাড়ি বের করল। পৌঁছে দিয়ে গেল গেস্টহাউসে।

বিকেল চারটে বাজে। আজ আর কোথাও যাওয়ার নেই। গেস্টহাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ঘুরছে পথের এপার থেকে ওপারে, চলমান মানুষের মুখ থেকে মুখে, কাছ থেকে দূরে, দূর থেকে আরও দূরে, অনেক দূর পর্যন্ত।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। এই পথটা সোজা হাঁটলেই পড়বে সেই দোকানটা যেখান থেকে আমি রোজ রুটি, জল আর খাবার কিনি।

দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে হুলানদের বাড়ি পাঁচ সাত মিনিটের পথ। একটু অপেক্ষা করলাম। তারপর ভেতরে ঢুকলাম। একটা বড় কেক

কিনে সোজা হুলানের দোকানে চলে গেলাম।

হুলান তখনও নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করছে। কেকটা ওর হাতে তুলে দিতে ভীষণ খুশি। সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে নিল।

'মা, আঙ্কেল একটা বড় কেক নিয়ে এসেছে। সবাই চলে এসো এখুনি।'

হুলান একটা ওষুধের মোড়ক দেখিয়ে বলল, 'এটা একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ, ভারতে তৈরি। এটা কি ভালো তুমি জানো আঙ্কেল?'

ছোট্ট দেশলাইয়ের বাক্সের আকারের। মোড়কটা মুম্বাইতে তৈরি, এই পর্যন্ত লেখা আছে। ওষুধের কোনও নাম নেই, কোম্পানির নাম নেই। মোড়কের মধ্যে আছে ওষুধ। সুতোর মতো সরু, লম্বায় পাঁচ-ছয় মিলিমিটার হবে। হালকা সিঁদুরের রং। হাতে একটু জল নিয়ে তার মধ্যে ভিজিয়ে আঙুল দিয়ে ঘসলাম। জলের রং একটু লালচে হল, কিন্তু গুঁড়ো করা গেল না। রবারের মতো বেঁকে আবার সোজা হয়ে যায়। শুকনো তৃণমূল অথবা অন্য কোনও ছোট গাছের শেকড় হতে পারে।

পেটের অসুখের জন্য লোকেরা কেনে। খুব বিক্রি হয়। পিকিং থেকে এরা কিনে আনে, শুধু ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ ভালো— এই বিশ্বাসে। একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছিলাম সন্ধান করে হদিস মেলে কিনা দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয়ে ওঠেনি।

সবাই চলে এল, দিদি, জিদান, গারিন, চান্দান, বুলগা। কেক খাওয়া হল সবাই মিলে।

সবাই বিদায় জানাল। শুধু বুলগা মুখ নিচু করে বসে রইল, কোনও কথা বলল না। অকারণ সংকোচে আমিও কিছু বলতে পারলাম না। হুলান বলল, 'আঙ্কেল, কাল বেলা ১২টার মধ্যে তৈরি হয়ে নেবে।'

পরদিন সকালে জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিলাম। গেস্টহাউসের ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। আমার ঘরের আলমারি সাজাবার জন্য মঙ্গোলিয়ার স্মৃতি কিছু কেনা হয়নি। মঙ্গোলিয়া স্টেট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাল বুলগার সঙ্গে এসেছিলাম। ওদেশের হস্তশিল্পদ্রব্য কিছু পছন্দ করে গেছি। চলে গেলাম ওখানে। সোজা পাঁচতলায় উঠে গেলাম। স্থানীয় হস্তশিল্পদ্রব্যের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। চমকে উঠলাম পিছন থেকে বাংলায় সম্বোধনে।

'নমস্কার।'

পিছন ফিরে দেখি একটি মেয়ে আমার পিছু পিছু আসছে।

'তুমি বাংলা শিখলে কোথায়?'

মেয়েটি বলল, 'আমি তিনবছর কলকাতায় ছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলোজফি নিয়ে পড়তাম। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষা খুব খারাপ হয়েছিল। তাই পরীক্ষা শেষ হতেই দেশে চলে আসি। ধরেই নিয়েছিলাম পাশ করতে পারব না। তাই আর যাইনি। পরে খবর পেলাম আমি পাশ করেছি। একবছর হয়ে গেছে। আপনি জানেন, এখন কি আমি পার্ট টু দিতে পারব?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পারবে। চলে যাও।'

মেয়েটি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আবার আমাকে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে কিনা, স্কলারশিপ পাব কিনা। আপনি কী বলতে পারবেন?'

আমি বললাম, 'অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে না, এইটুকু বলতে পারি। কারণ একবছর দেরি হলেও তুমি এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আছ। তবে স্কলারশিপ পাবে কিনা আমি বলতে পারব না। ও নিয়মটা আমার জানা নেই।'

'আপনি কি খবর নিয়ে আমাকে জানাতে পারবেন?'

'তা পারব। কিন্তু এ ব্যাপারে সব কাগজপত্র আমাকে দিতে হবে তো। এসব কী এখন তোমার সঙ্গে আছে?'

'না, সঙ্গে নেই। আপনি কবে যাবেন?'

'আজই চলে যাব, একটু পরেই। তুমি এক কাজ করো, আমার ঠিকানা তোমাকে দিচ্ছি। তুমি চিঠি লিখে সব জানিয়ো।'

ওর ডায়েরিতে আমার ঠিকানা লিখে দিলাম। মেয়েটি চলে গেল। কিছু কেনাকাটা করে আমি ফিরে এলাম গেস্টহাউসে। জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে এসেছি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুলান চলে এল গাড়ি নিয়ে।

জিনিসপত্র গাড়িতে তুলেই বেরিয়ে পড়লাম। মিনিট দশেক পরেই এক গলিতে গাড়ি থামাল।

লাঞ্চ হল এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টে। মালিক দিল্লির এক যুবক। রাঁধুনিও নিয়ে এসেছে দিল্লি থেকে।

আমি টাকা দিতে যাচ্ছিলাম। হুলান আমাকে থামিয়ে দিল।

বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে হুলান ওদের আবাসনের সামনে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'বাবা এসেছে, দেখা করবে?'

'নিশ্চয়ই, চলো।'

আজ সকালেই এসেছেন। খুব আনন্দপ্রকাশ করলেন। মঙ্গোলীয় কুটির শিল্পের একটা সুন্দর ব্যাগ আমাকে উপহার দিলেন।

বিমানবন্দরে পৌঁছলাম ২টো বেজে ৩০ মিনিটে।

অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে হুলান আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'আঙ্কেল, গিয়েই আমাকে মেল করবে কিন্তু।'